গ্যাট'৯৪
কার স্বার্থে

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া

প্রকাশকের কথা

গ্যাট এবং ভারত সরকারের নয়া আর্থিক ও শিল্পনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আমাদের দলের ইংরাজি ও বাংলা মুখপত্রে ইতিপূর্বে নানা নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। গ্যাট সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার প্রয়োজনেই বর্তমান পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হল।

১লা অক্টোবর, ১৯৯৪
৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

প্রভাস ঘোষ

গ্যাট '৯৪ ঃ কার স্বার্থে

নয়া গ্যাট আইন যাকে অনেকেই চলতি ভাষায় ডাংকেল চুক্তি বলেছেন, তা নিয়ে আমাদের দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যের কোন বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের স্তর পর্যন্ত এত আলোড়ন এদেশে বা বিদেশে ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। অর্থনীতির ভালমন্দ এবং তথ্য ও তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা বুদ্ধিজীবী ও পন্ডিতদের পুঁথিগত বিতর্কের সীমানা ছাড়িয়ে এবার সাধারণ মানুষের স্তর পর্যন্ত যে পৌঁছেছে তার কারণ, মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই আশঙ্কা করছেন যে, গ্যাটের ফলাফল দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তাছাড়া সরকারী নীতির যাবতীয় কুফল সর্বদা দেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হয়। 'সুফল' যা হয়, তা মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায়ের পকেটে যায়। এই অবস্থায় নয়া গ্যাটের চরিত্র ও উদ্দেশ্যকে খুঁটিয়ে বিচার করা এবং তার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরী।

নয়া গ্যাট সম্পর্কে আমাদের দেশে মতামত মূলতঃ পক্ষে ও বিপক্ষে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। পাশাপাশি তৃতীয় এক ধরনের মতামতও শোনা যাচ্ছে, যাঁরা বলছেন — নয়া গ্যাটের ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। এই ভাল-মন্দের প্রবক্তারা নিজেদের সরকারী মুখপাত্ররূপে পরিচয় দিতে না চাইলেও, তাঁরা যা বলছেন তার সাথে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বক্তব্যের বাস্তবে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। নরসিমা রাও সরকারের বক্তব্য গত ১৭ই ডিসেম্বর '৯৩ লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জীর বিবৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালেও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী গ্যাট-বিষয়ে ভারত সরকারের প্রধান প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে আরও বহু বিষয়ই বলেছেন এবং এখনও বলে চলেছেন।

বিরোধীদের সমস্ত মতামত ও সমালোচনা নস্যাৎ করে দিয়ে নয়া গ্যাটের পক্ষে কংগ্রেস সরকার যা বলছে তার মূল কথা হল — এই চুক্তির ফলে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা উদার হবে, শুল্ক ও অন্যান্য বাধা বহুলাংশে উঠে যাবে এবং ভারতের রপ্তানি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ভারতের লাভ কি পরিমাণ বিশাল ও বিপুল হবে, তা প্রমাণ করার জন্য সরকারী মুখপাত্রদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতাও চলছে। কখনও বলা হচ্ছে, ভারতের রপ্তানি আয় বছরে ২০০ কোটি টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে ; কখনও ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে ; যদিও এই হিসাবের বাস্তব ভিত্তি কি, তা কেউ পরিষ্কার করে বলছেন না। সবটাই অনুমাননির্ভর। অথচ, অনুমাননির্ভর এই রপ্তানিবৃদ্ধিকেই 'দেশের উন্নয়নের পথ' হিসাবে প্রচার করে বলা হচ্ছে যে, এজন্য ভারতীয় শিল্প, কৃষি ও পরিষেবার উন্নয়নে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ দরকার। ফলে, ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আর্থিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেসের অল ইন্ডিয়া কমিটির বিগত জাতীয় অধিবেশনে স্বয়ং নরসিমা রাও একে কংগ্রেসের নীতি বলে ঘোষণা করেছেন।

সুতরাং, কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আর্থিক ও শিল্পনীতির সঙ্গে নতুন গ্যাটের সম্পর্ক কেবল ঘনিষ্ঠই নয়, এই দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুটি ক্ষেত্রেই সরকার 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার দোহাই দিচ্ছে। দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী, ধনী চাষী ও বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং কেন্দ্রীয় সরকার — সকলেরই বক্তব্য হচ্ছে, উদার আর্থিক ও শিল্পনীতি থেকে গ্যাট চুক্তিতে সই দেওয়া পর্যন্ত, সরকার যা কিছু করছে সবই 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার জন্য, সবই 'দেশের উন্নয়নের' জন্য !

আমরা জানি, ভারতবর্ষ একটি শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী দেশ। এর একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় যারা ব্যক্তিমালিকানার জোরে সমাজের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করছে, আর অন্যদিকে রয়েছে কোটি কোটি শোষিত দরিদ্র জনসাধারণ। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ কখনও এক ও অভিন্ন হতে পারে না। এই অবস্থায় 'জাতীয় স্বার্থ' 'দেশের উন্নয়ন' বলতে তা কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ, বা কোন্ শ্রেণীর উন্নয়ন — অর্থাৎ, তা জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ সাধারণ জনগণের উন্নয়ন, না মুষ্টিমেয় ১০ শতাংশ মালিকশ্রেণী ও ধনী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, তা স্পষ্ট করে না বলে 'জাতীয় স্বার্থ' ও 'দেশের উন্নয়নে'র কথা বলা আসলে জনগণকে ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। এর দ্বারা জনস্বার্থকে পদদলিত করে বাস্তবে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হীন উদ্দেশ্যটিই

চরিতার্থ করা হয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে সরকার ও শাসক দলগুলো বরাবর 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার কথা বলে জনগণকে ঠকিয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থ রক্ষার কাজটিই করেছে। তার পরিণামেই আমাদের দেশে স্বাধীনতার ৪৭ বৎসর বাদে ৬০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে, কোটি কোটি বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ২০টি একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর সম্পদ গত ৪১ বছরে ('৪৭-'৮৮) ৮৫৯২.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই একচেটে পুঁজিপতিরাই এখন মুনাফাবৃদ্ধির উদগ্র লালসায় অর্থনীতির 'আন্তর্জাতিকীকরণের' ধুয়া তুলছে। আর একচেটে পুঁজিপতি ও ধনী চাষীদের স্বার্থরক্ষার এই প্রচেষ্টাটিকেই 'জাতীয় স্বার্থ' বলে ঢাক পেটানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য, 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার এই প্রচারে বিভ্রান্ত হলে জনসাধারণকেই আবার ঠকতে হবে।

নতুন গ্যাট নিছক রপ্তানি বাণিজ্যের চুক্তি নয়

নতুন গ্যাটকে প্রচারের মধ্য দিয়ে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যাতে মনে হবে, এটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিছক একটা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের চুক্তিমাত্র, যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল দেশেরই রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে ! এভাবে প্রচার করার দ্বারা এটাই দেখাতে চাওয়া হচ্ছে যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য-সংঘাত চলছে, তা নিছক 'মুক্ত বাণিজ্য' বনাম 'সংরক্ষণ নীতির' সংঘাত ! অর্থাৎ, দেশে দেশে আমদানির পথে শুল্ক ও অন্যান্য যেসব বাধা আছে, যাকে সংরক্ষণ বলা হয় — যেন তা হ্রাস বা অপসারণ করা নিয়েই সংঘাত দেখা দিচ্ছে এবং এই সংরক্ষণের বাধা ভেঙে 'মুক্ত' বা 'অবাধ' বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা হলেই বাণিজ্য-সংঘাত দূর হয়ে যাবে এবং গ্যাট-এর মধ্য দিয়ে সেটাই যেন করা হয়েছে। এই অর্থেই গ্যাটকে মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তি বলা হচ্ছে। আসলে নতুন গ্যাটের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটিকেই এই প্রচারের মধ্য দিয়ে আড়াল করতে চাওয়া হয়েছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার বাণিজ্য-বিরোধকে আপাত অর্থে 'সংরক্ষণ' বনাম 'মুক্ত বাণিজ্যের' বিরোধ বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। এই বিরোধের মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দুনিয়াকে লুটের বাজাররূপে নতুন করে ভাগ করে নেওয়ার স্বার্থের সংঘাত যা বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের তীব্র ও মজ্জাগত সংকট থেকে দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির

পরস্পর বিরোধের মূলে রয়েছে বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি। এই বিরোধ যখন আলাপ-আলোচনার আপাতঃ শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসা হয় না, তখনই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।আবার যদি দেখা যায়, যুদ্ধ ব্যতিরেকে সাময়িকভাবে হলেও বাজার নিয়ে বিরোধের একটা মীমাংসায় তারা পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে নিশ্চিতরূপেই বুঝতে হবে, 'শান্তিপূর্ণ' দখলদারি ও শোষণের কোন নতুন উপায়ের মধ্য দিয়েই তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। ডাংকেল প্রস্তাব বা নতুন গ্যাট এরকমই একটি উপায় যার মধ্য দিয়ে দুনিয়াকে 'শান্তিপূর্ণ' পথে নতুন করে ভাগ করে শোষণ চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদিও ভাগের এই সাম্রাজ্যবাদী বোঝাপড়াও সাময়িক হতে বাধ্য।

১৯৪৮ সালে গ্যাট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯৪৮ সালে গ্যাট-এর প্রতিষ্ঠা হলেও কার্যতঃ তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস্ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। গ্যাটকে বলা হয়েছিল মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তি। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাংক। আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আই এম এফ-কে। বিশ্বব্যাঙ্কের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির 'পুনর্গঠন ও বিকাশে' সাহায্য করা। বিশ্বের শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে আমেরিকার উদ্যোগে এবং ডলারে এই দুটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। পণ্য আমদানি-রপ্তানি অবাধ করার জন্য বহুপাক্ষিক চুক্তি — যার ফলস্বরূপ গ্যাট-এর প্রতিষ্ঠা, তা রচনা করার জন্যও আমেরিকাই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল।

ফলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বর্তমানে যে তিনটি আর্থিক ও বাণিজ্য সংস্থা কার্যতঃ প্রভুত্ব করছে, তার সবকটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে তোলা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল। ১৯২৯-৩০ সালের মহামন্দা বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতির ভারসাম্যে গুরুতর আঘাত হেনেছিল, শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বাজার সংকটকে তীব্র করেছিল। এরই পরিণতিতে বিশ্ববাজারের ভাগ এবং উপনিবেশগুলির দখল নিয়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয়। কিন্তু সংকট নিরসনের পরিবর্তে যুদ্ধের পর বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতি আরও তীব্র ও সর্বাত্মক সংকটের সম্মুখীন হয়।

কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমে ক্রমে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার পাল্টা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অভ্যুত্থান ঘটে এবং ঐ বিশাল ভূখন্ড বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের বাইরে চলে যাওয়ার ফলে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজার বহুল পরিমাণে খন্ডিত ও সংকুচিত হয়ে যায়। তার উপর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ পুরনো ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে নিজ নিজ দেশে স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠন করে এবং ইতিমধ্যে সংকুচিত বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারেই নতুন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়।

যুদ্ধের ফলে ইউরোপের বিশেষতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করার ফলে নির্বিচার শোষণ ও লুণ্ঠন চালাবার অবাধ বাজারও তাদের হাতছাড়া হচ্ছিল। ফলে ইউরোপের পুঁজিবাদ যুদ্ধের পর বিশেষভাবে গুরুতর সংকটে পড়েছিল। তীব্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের দুর্নিবার আকর্ষণ ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতনের আশু সম্ভাবনা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ইউরোপের শাসকরা অর্থনীতির দ্রুত পুনর্গঠনে উদ্যোগী হয়ে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যের আবেদন নিয়ে আমেরিকার দ্বারস্থ হয়েছিল। যুদ্ধের পর আমেরিকা তখন অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে ব্রিটেনকে হঠিয়ে বিশ্বপুঁজিবাদী শিবিরের নেতার পদে বসেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিন অর্থনীতিতে কৃত্রিম তেজীভাবের মধ্য দিয়ে বিপুল প্রাচুর্য নিয়ে এসেছিল। যুদ্ধের ধ্বংস থেকে দূরে ছিল আমেরিকা। তদুপরি, যুদ্ধের সময় ইউরোপের মিত্র দেশগুলিতে সমরাস্ত্র, শিল্প ও কৃষিপণ্যের প্রধান বিক্রেতা ছিল মার্কিন কোম্পানীগুলি। যুদ্ধের চাহিদা মার্কিন অর্থনীতিতে বিপুল উদ্বৃত্ত পুঁজি ও বিপুল উদ্বৃত্ত উৎপাদনক্ষমতার সৃষ্টি করেছিল, শিল্প প্রযুক্তিরও দ্রুত বিকাশ ঘটিয়েছিল। যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার ও অতিরিক্ত পুঁজির পূর্ণ ব্যবহার শুধুমাত্র আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা দিয়ে সম্ভব ছিল না। অথচ যুদ্ধশেষে বিশ্ববাজারে মার্কিন পণ্যের চাহিদা আর তেমন থাকার কথা নয়। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, যুদ্ধের আগে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের যা পরিধি ছিল, তাও বহুলাংশে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় আমেরিকা বিশাল উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগ ও পণ্য রপ্তানির বাজারের সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। অন্যদিকে, আমেরিকার কলকারখানার উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় তেল ও কাঁচামালের ভান্ডার, যা

মূলতঃ এশিয়া-আফ্রিকার পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে অবস্থিত, সেখানেও মার্কিন আধিপত্য ছিল না। সেগুলি ছিল মূলতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশ ; আবার তাদের অনেকেই তখন স্বাধীনতা লাভ করে স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্ররূপে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। এই অবস্থায় উদ্বৃত্ত পুঁজি ও পণ্যের বাজার এবং পূর্বতন উপনিবেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকা নতুন নতুন ফন্দি বের করার মরিয়া চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও শিল্পপণ্যের বাজার হওয়ার মত অর্থনৈতিক স্থিতি এইসব পশ্চাৎপদ দেশগুলির তখন ছিল না। ফলে শিল্পপণ্যের বাজারের জন্য পশ্চিম ইউরোপের দিকেই আমেরিকাকে নজর দিতে হয়। তাছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার ধাক্কা পড়েছিল পশ্চিম ইউরোপেও যাকে প্রতিহত করার প্রধান দায়িত্ব ছিল সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নতুন নেতা আমেরিকার। আমেরিকার স্বার্থেও ইউরোপের অর্থনীতির পুনর্গঠন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মার্কিন রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার সুনিশ্চিত করার জন্য আমেরিকার পক্ষে এটা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত জরুরী।

সুতরাং, ইউরোপের পুঁজিবাদ ও মার্কিন পুঁজিবাদ — উভয়েই বাঁচার স্বার্থে পরস্পর বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। ("The United States needed Europe perhaps as much as European capitalism needed the United States for its survival." — The Climax of Capitalism : Tom Kemp — Orient Longman, UK, 1990) ১৯৪৭ সালের মে মাসে আমেরিকা প্রথমে গ্রীস ও তুর্কিকে অর্থসাহায্য দেয়। তারপর জার্মানির পুনর্গঠন সহ সমগ্র ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের জন্য ১৯৪৭ সালের জুন মাসে 'মার্শাল প্ল্যান' ঘোষণা করে। মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে দেওয়া মার্কিন অর্থ কিভাবে ব্যয় করতে হবে, আমেরিকা তার শর্তাদিও দিয়ে দিয়েছিল। অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল, ইউরোপের বাজার মার্কিন পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং 'সমাজতন্ত্রকে রুখতে' ইউরোপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনে অনুমতি দিতে হবে। এই সময়ই 'সোভিয়েট আতঙ্কে'র জিগির তুলে বিশ্বে 'ঠান্ডা যুদ্ধে'র সূচনা করেছিল আমেরিকা, যার মধ্য দিয়ে মার্কিন অর্থনীতির সামরিকীকরণের স্থায়ী কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল। সমগ্র মার্কিন পরিকল্পনাই তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম অনুসারে 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' নামে পরিচিত।

মার্শাল প্ল্যানের শর্তের মধ্য দিয়ে মার্কিন পণ্যের জন্য পশ্চিম ইউরোপের বাজার খোলার ব্যবস্থা হলেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হল না। পশ্চিম ইউরোপের বাজার নানা শুল্কের প্রাচীরে আবদ্ধ ছিল। শুল্কের বাধা অপসারণের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা না করতে পারলে, শুধু মার্শাল প্ল্যানের শর্তে ইউরোপে মার্কিন পণ্যের স্থায়ী রপ্তানি বাজার হওয়া সম্ভব নয়। ফলে মার্শাল প্ল্যান ছাড়াও শুল্কের বাধা অপসারণের জন্য নতুন বাণিজ্য বোঝাপড়া আমেরিকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া কেবল পশ্চিম ইউরোপ নয়, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পূর্বতন উপনিবেশগুলির বাজারেও বাণিজ্যের পথে প্রবেশ করতে হলে আমেরিকার নতুন বাণিজ্য বোঝাপড়া প্রয়োজন ছিল। কারণ, এইসব সদ্যস্বাধীন আপেক্ষিক অর্থে দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলির বহির্বাণিজ্য তখনও প্রধানতঃ ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে চলছিল — যা মার্কিন পণ্য ও পুঁজির বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করছিল। এইজন্যই আমেরিকা বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার নামে 'মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা' কায়েম করার আওয়াজ তুলেছিল। এর সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের অবাধ বাণিজ্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই তথাকথিত 'মুক্ত বাণিজ্যে'র মূল কথা ছিল শুল্ক ও অন্যান্য বাধা দূর করে দেশে দেশে মার্কিন পণ্য ও পুঁজির প্রবেশ সুনিশ্চিত করা। এই পথেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংকুচিত ও খন্ডিত বাজারে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্বে 'মুক্ত বাণিজ্য'কে হাতিয়ার করেছিল, যদিও মুখে বিশ্বের উন্নয়নের জন্যই মুক্ত বাণিজ্যের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছিল।

১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস্ সম্মেলনেই আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্যের কথা তুলেছিল। (In fact, the Bretton Woods System became an instrument for the attaining of American aims in the world economy. High among them was a universal open-door policy : breaking down national barriers to the free movement of goods and capital, assumed to be in the interest of the United States. —Ibid, p—121) একটি স্থায়ী বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠনের প্রস্তাব উঠেছিল ব্রেটন উডস্ সম্মেলনে। কিন্তু আমেরিকা তাতে রাজি হয়নি। পরে ১৯৪৭ সালে স্থায়ী বাণিজ্য সংস্থার পরিবর্তে সাময়িক বাণিজ্য বোঝাপড়ার রূপে

২৩টি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে নিয়ে আমেরিকাই গ্যাট তৈরির জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। জেনিভায় একটি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল GATT বা জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস্ অ্যান্ড ট্রেড, অর্থাৎ, আমদানি শুল্ক কমাবার একটি সাধারণ চুক্তি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অতিরিক্ত পুঁজি ও অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই আমেরিকা বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ ও সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে মার্কিন পণ্য ও পুঁজির অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত করার জন্যই মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার ধুয়া তুলেছিল। ইউরোপের শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধবিধ্বস্ত নিজ নিজ অর্থনীতিকে বাঁচানোর তাগিদে মার্কিন প্রস্তাবের সাথী হয়েছিল। উভয়ের সমঝোতার ভিত্তিতেই ১৯৪৮ সালে গ্যাটের সূচনা ঘটেছিল। ভারতের শাসকশ্রেণীও ঐসময়ই বিশ্ব বাজারে প্রবেশের আশায় গ্যাট-এর সদস্য হয়েছিল।

শুল্ক ও অশুল্ক বাধা

কোন দেশের বহির্বাণিজ্য বলতে সেই বিশেষ দেশের আমদানি-রপ্তানিকে বুঝিয়ে থাকে। আমদানি-রপ্তানি কোন দেশের অর্থনীতির একটি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দিক। প্রতিটি দেশেরই লক্ষ্য থাকে আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানো যাতে বিদেশী মুদ্রা বেশি পরিমাণে আয় করা সম্ভব হয়। সব দেশই আমদানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে 'স্বনির্ভর' হতে চায় ; কিন্তু কিছু আবশ্যিক আমদানি যেহেতু প্রায় সব দেশকেই করতে হয়, (যেমন যেসব দেশে জ্বালানি তেল নেই, তাদের তেল আমদানি করতেই হয়) তাই আমদানি-ব্যয় মেটাবার জন্য রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধি ঘটানোর আকাঙ্খা স্বাভাবিক নিয়মেই কাজ করে। বিদেশী দ্রব্যের আমদানি আটকাবার জন্য বিদেশী দ্রব্যের উপর কর বা আমদানি শুল্ক বসানো হয় ; একে বলা হয় 'ট্যারিফ ব্যারিয়ার' বা শুল্কের বাধা। শুল্ক বসানো ছাড়াও অন্যান্য নানা পথে আমদানিতে বাধা আরোপ করা হয় ; একে বলা হয় 'নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার' বা অশুল্ক বাধা। এই নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার বহু রকম হতে পারে। যেমন, বিদেশী দ্রব্যের আমদানি কোটা বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা একটি নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার। এছাড়া, কোন দেশ অপর দেশের বিশেষ বিশেষ পণ্য — 'নিম্নমান সম্পন্ন' 'স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর', 'পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর' বলে সেসবের আমদানি নিষিদ্ধ করে দিয়ে থাকে। যেমন, এবারে আমেরিকা বাণিজ্যে 'সামাজিক ধারা' (social clauses) নামে একটি নতুন বিধির কথা তুলেছে। এই

ধারার অর্থ হচ্ছে, যে দেশের বিরুদ্ধে 'মানবাধিকার লংঘনে'র অভিযোগ থাকবে, শিশুশ্রম ব্যবহার করার, কিংবা কম মজুরিতে কাজ করাবার অভিযোগ থাকবে, সেসব দেশের পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। এইসব জনদরদের বুলির আড়ালে আসলে আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশের রপ্তানি যতটা সম্ভব আটকে দিয়ে বিশ্ববাজারে নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখা। আবার, এইসব নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ারগুলিকে রাজনৈতিক-স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করাও আমেরিকার বৈশিষ্ট্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুক্ত বাণিজ্য বলতে যদি অবাধ প্রতিযোগিতা বোঝায়, তবে তা আজ পুঁজিবাদী বাজারে আদৌ বিরাজ করে না। একচেটিয়া পুঁজির যুগে তা আর ফিরে আসতেও পারে না। বর্তমান দুনিয়ায় 'মুক্ত বাণিজ্য' কথাটার আসল অর্থ হচ্ছে, যতটা সম্ভব নিজের বাজারে সংরক্ষণ বজায় রেখে অপরের বাজার মুক্ত করা। প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সরকার নিজ নিজ দেশের জাতীয় ও কসমোপলিটান পুঁজির স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় বাজারের সংরক্ষণ ও বিদেশের বাজার দখল করার জন্য চেষ্টা চালায় এবং সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যস্বার্থই মুখ্য ভাগ দখল করে। আমদানি-রপ্তানির গুণাগুণ বোঝাতে অর্থনীতিতে তুলনামূলক সুবিধার (comparative advantage theory) একটা তত্ত্ব আছে, যার মূল কথা হচ্ছে, যে দেশের যে পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা বেশি, সেই দেশ সেই পণ্য বেশি উৎপাদন করে রপ্তানি করবে এবং যে পণ্য উৎপাদনে অসুবিধা তা আমদানি করবে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম বন্টন হবে এবং সকল দেশ আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনের পূর্ণ সুযোগ নেবে — এটা হচ্ছে তত্ত্বগত ধারণা। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির বইয়ের এই তত্ত্ব বাস্তবে বিরাজ করে না। কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে চলে না ; উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিমালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থেই পরিচালিত হয়। পুঁজিবাদ বিকাশের পথে একচেটিয়া লগ্নী পুঁজির বা সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করার পর, বিশ্ববাজারের ভাগ নিয়ে দ্বন্দ্ব তখন আর কেবল পণ্য রপ্তানির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তখন আর কেবল পণ্য রপ্তানি করে না, তার সঙ্গে পুঁজিও রপ্তানি করে যা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থারই অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির একচেটিয়া লগ্নী

পুঁজি বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ দেশগুলির অর্থনীতিকেই বেছে নেয়। একারণেই একচেটিয়া লগ্নী পুঁজির বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশ, অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজির উপর শক্তিমান পুঁজির দাপট ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন ও ইউরোপীয় পুঁজিবাদ — ভিন্ন দুই দিক থেকে সংকটে পড়ে নিজ নিজ জাতীয় পুঁজির স্বার্থেই বাণিজ্য বোঝাপড়ায় সামিল হয়েছিল। আবার, সমগ্র বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পটভূমিতে তাদের এই উদ্যোগের মধ্যে সেদিন সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাও ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একথাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক বিরোধ ও সংকট শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। এরই ফলে মার্কিন নেতৃত্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের পর গ্যাটের বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে 'শৃঙ্খলা' কায়েম করে আগেকার আপেক্ষিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্যও চেষ্টা চালিয়েছিল, যদিও অনিবার্যভাবেই তা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

পুরনো গ্যাট কি ছিল

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৭-৪৮ সালে গ্যাট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বাইরে বহু পুঁজিবাদী দেশকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সাধারণ বাণিজ্য বোঝাপড়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। এজন্য গ্যাটকে বলা হয় বহুপাক্ষিক (multilateral) বাণিজ্য চুক্তি। কিন্তু সেটা ছিল নির্দিষ্ট কিছু পণ্যে শুধুমাত্র শুল্কসংক্রান্ত বোঝাপড়া। গ্যাট-এর মূল প্রস্তাব বা বিধান যা ছিল, তা হচ্ছে, বিভিন্ন দেশে বিদেশী পণ্যের প্রবেশ আটকাবার জন্য নানারকম শুল্ক ও শুল্কব্যতীত অন্যান্য যেসব বাধা আরোপ করা আছে, গ্যাট-সদস্য দেশগুলি নিজেদের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি করার সময় তা কমাবে বা ছাড় দেবে। এছাড়া অ-শুল্কের বাধাগুলি ধীরে ধীরে লোপ করার কথাও সেখানে বলা হয়েছিল। এজন্য অ-শুল্ক বাধা, বিশেষতঃ আমদানি কোটা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তার স্থানে আমদানি শুল্ক বসাবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ, আমদানি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকলে তার জন্য আমদানি শুল্ক বসানো যেতে পারে, অ-শুল্কের বাধা নয়। গ্যাট-সদস্য দেশগুলির মধ্যে শুল্ক ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থাকেই

বলা হয় সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপক রাষ্ট্রের (Most Favoured Nation Clause বা MFN) বিধান। অর্থাৎ, গ্যাট-সদস্য দেশগুলি নিজেদের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে একে অপরকে 'সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ' রূপে দেখে সবচেয়ে বেশি শুল্ক ছাড় দেবে, যাতে একের পণ্য অন্য দেশে সহজে প্রবেশ করতে পারে।

গ্যাট-সদস্য দেশগুলির পরস্পর বাণিজ্যের জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করতে হয় না, তা নয়। আমদানি-রপ্তানি সবসময় দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। কিন্তু দুটি দেশই যদি গ্যাট-সদস্য হয়, তবে যেসব নির্দিষ্ট পণ্যে বিশেষ শুল্ক ছাড়ের সুযোগ দেওয়ার কথা গ্যাট-এ বলা আছে, সেইসব পণ্যের আমদানি-রপ্তানিতে একে অপরকে ঐ বিশেষ শুল্ক ছাড় দিতে বাধ্য থাকবে। তার জন্য আলাদা বোঝাপড়ার প্রয়োজন হবে না। এই শুল্ক ছাড় গ্যাট-সদস্য না হয়েও দুটি দেশ পরস্পরকে দিতে পারে। আবার দুটি দেশের মধ্যে যদি একটি দেশ গ্যাট-সদস্য নাও হয়, তবে গ্যাট-সদস্য অপর দেশটি ইচ্ছা করলে ঐ দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে 'সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশে'র বোঝাপড়া করতেই পারে ; সেখানে গ্যাট-সদস্য হওয়া বা না হওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। অর্থাৎ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গ্যাট-সদস্য দেশগুলি গ্যাট-বহির্ভূত অন্য কোন দেশের সঙ্গে পৃথক কোন সুবিধার চুক্তি করলে তাতে গ্যাট-এর বিধানে কোন বাধা ছিল না। এই অর্থেই গ্যাট সাধারণ বাণিজ্য বোঝাপড়ার বেশি কিছু ছিল না। নতুন গ্যাটে আর তা চলবে না। ভারতের বাজারে জাপানী-ইউরোপীয়-মার্কিন পুঁজিকে সমান সুযোগ ও অধিকার দিতে হবে। কোন ভারতীয় কোম্পানীকে যা সুবিধা দেওয়া হবে, বিদেশীদেরও তা দিতে হবে।

যেহেতু সদস্য দেশগুলির সমস্ত পণ্য গ্যাট ব্যবস্থার আওতায় ছিল না, নির্দিষ্ট কিছু পণ্য ধরেই ঐ চুক্তি করা হয়েছিল এবং শুল্ক ছাড়াছাড়ির কোন সাধারণ ও স্থায়ী মানদন্ডও যেহেতু নির্ধারণ করা হয়নি, তাই ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রথম গ্যাট চুক্তি হওয়ার পর থেকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর গ্যাট-সদস্য দেশগুলি বৈঠকে বসে নতুন নতুন পণ্য ও শুল্কের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করত। এই বৈঠকগুলিকেই বলা হয় রাউন্ড। কখনও বৈঠকের স্থানের নামে, কখনও শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির মন্ত্রী বা নেতাদের নামে বৈঠকের নামকরণ করা হয়েছে। গ্যাট-এর অষ্টম বৈঠক উরুগুয়েতে বসেছিল বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল উরুগুয়ে রাউন্ড।

অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী ('উন্নয়নশীল') দেশগুলির জন্য বিশেষ সুবিধার বিধান

এখন, গ্যাট-এ 'সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ' সম্পর্কিত যে ধারাটি রয়েছে, সে সম্পর্কে পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়। কারণ, ঐ বিশেষ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে একই পণ্যে ও একই হারে শুল্ক ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, যেজন্য ঐ ধারাকে 'reciprocity clause' বলা হয়। শক্তিমান ও দুর্বল দেশগুলির মধ্যে পরস্পর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ধারা বাস্তবে অসমান হতে বাধ্য। কারণ, শিল্পে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ দুর্বল রাষ্ট্রগুলি যা রপ্তানি করে তার বেশিরভাগটাই মূলতঃ কৃষিপণ্য অথবা শিল্পের কাঁচামাল। এই সব পণ্যের দাম শিল্পপণ্যের তুলনায় কম। দ্বিতীয়তঃ শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির সাথে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির রপ্তানি পণ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে, শক্তিমান দেশগুলিতে পণ্য রপ্তানির প্রশ্নে দুর্বল দেশগুলি যে শুল্ক ছাড় পেতে পারে, সেই একই হারে যদি শক্তিমান দেশগুলি থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় দুর্বল দেশগুলিকে দিতে হয়, তবে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রহসন হয়ে যায়। তাই গ্যাট-এর 'সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ'-এর ধারাটি সংশোধন করে পরবর্তীকালে স্থির করা হয় যে, গ্যাট-সদস্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলি — যাদের 'উন্নয়নশীল' বলে অভিহিত করা হয় — তাদের রপ্তানি আয় যেহেতু কম এবং সেজন্য তারা বিদেশী মুদ্রার সংকটে ভুগছে, সেহেতু তাদের ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাড়তি শুল্ক বসাবার অধিকার থাকবে। একেই গ্যাট-এর বিদেশী মুদ্রার সংকট সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা বলা হয়। এর দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলি গ্যাট-সদস্য হয়েও আমদানি নিয়ন্ত্রণের কিছু বাড়তি অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির মূল দাবী হচ্ছে, বিশ্ববাজারে তাদেরও রফতানি বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে — যা শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি তাদের দেশে নানা বাধার প্রাচীর খাড়া করে হতে দিচ্ছে না। ৬০-এর দশকে সদ্য স্বাধীন অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী দেশগুলি যখন নানা জোট বেঁধে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে ভাগ দাবী করল এবং রাষ্ট্রসংঘকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে বাধ্য করল, তখন ১৯৬৫ সালে গ্যাট-এর ধারায় আর একটি সংশোধন করা হয়েছিল। 'সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপক দেশ'-এর ব্যবস্থার বাইরে জেনারালাইজড্ সিস্টেম অফ্ ট্রেড প্রেফারেন্সেস (GSP) নামে এই সংশোধনীতে স্থির করা হয়েছিল যে, শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি বিশেষ কিছু পণ্য

দুর্বল দেশগুলি থেকে শুল্ক ছাড় দিয়ে আমদানি করতে বাধ্য থাকবে। এজন্য কোন পাল্টা শুল্ক ছাড় দুর্বল দেশগুলির কাছ থেকে শক্তিমান দেশগুলি দাবী করবে না। অর্থাৎ, 'এক দেশ যে ছাড় দেবে, অপরকেও সেই ছাড় দিতে হবে' — এই মর্মে যে reciprocity'র কথা সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপক দেশ-এর ধারার মধ্যে নিহিত আছে এবং যা শক্তিমান দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দুর্বল দেশগুলিকে দিতে হত, GSP-র দ্বারা সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। এর ফলে গ্যাট-সদস্য উন্নত ও 'উন্নয়নশীল' পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ১৬টি পণ্যে MFN-এর কোন ভূমিকা ছিল না, তা GSP দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। নতুন গ্যাটে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত (উন্নয়নশীল) দেশগুলির জন্য GSP ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আমদানির দরজা মুক্ত করে দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি জোট বেঁধে এবং শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বলীয়ান হয়ে শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যতটুকু বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করেছিল, নতুন গ্যাট তা বাতিল করে দিয়েছে।

'মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা'র প্রহসন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত মুক্ত বাণিজ্যের ধুয়া তুলে মার্কিন পণ্যের জন্য ইউরোপের বাজার খোলার যে পরিকল্পনা আমেরিকা করেছিল, গ্যাট প্রতিষ্ঠার দশ বছরের মধ্যেই তা ইউরোপের কাছ থেকে ধাক্কা খায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পদানত পশ্চিম জার্মানী আবার মার্কিন সাহায্য ও সহায়তা নিয়ে মাথা তুলতে শুরু করে। জার্মানীর নেতৃত্বেই ১৯৫৭ সালে রোম চুক্তির মধ্য দিয়ে ইউরোপের জন্য পৃথক বাণিজ্য জোট, ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের জন্ম হয় — যা মার্কিন বাণিজ্যের পথে পরোক্ষ সংরক্ষণ গড়ে তোলে। ষাটের দশকে বিশ্বের প্রায় সকল পুঁজিবাদী দেশই নানা বাণিজ্যিক ও আর্থিক জোটে বিভক্ত হয়ে যায়। এইসব জোটভুক্ত পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে সহজ বাণিজ্যিক লেন-দেনের পৃথক ব্যবস্থা করে নিয়েছে ; কোথাও তা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ভিত্তি করে হয়েছে, আবার কোথাও বিশেষ বিশেষ পণ্য উৎপাদক ও রফতানিকারক দেশের মধ্যে করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই নিজেদের জাতীয় বাজারে অপর রাষ্ট্রের পুঁজি ও পণ্যের প্রবেশ আটকে নিজেরা অপরের বাজারে ঢুকতে চেয়েছে। শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বাজারের সংরক্ষণে শুল্কের চাইতে অ-শুল্কের বাধা ক্রমেই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ

দেশগুলি থেকে আমদানির ক্ষেত্রে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি যে ধরনের অ-শুল্ক বাধা খাড়া করে থাকে, শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির পরস্পর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে সেগুলি প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক। তাছাড়া শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির একের সাথে অপরের পণ্যের গুণগত মানেও পার্থক্য খুব বিরাট নয়। ফলে, প্রতিটি শক্তিমান রাষ্ট্র বাজারে নিজ নিজ দেশীয় পণ্যের দাম কম রাখার উপায় হিসাবে নানারকমের ভরতুকি ব্যবস্থা চালু করেছে। এ ধরনের ভরতুকি ব্যবস্থা ঐসব দেশের সরকারী আর্থিক ও বাণিজ্যনীতির অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ভারতেও এটা আছে, যা রফতানি ভরতুকি নামে পরিচিত এবং এই ভরতুকি প্রধানতঃ মালিকগোষ্ঠীই পায়। তবে ব্যাপক দরিদ্র জনসাধারণের জন্য খাদ্যদ্রব্যে ভরতুকি দেওয়ার কিছুটা ব্যবস্থা ভারত সরকার চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। শিল্পোন্নত দেশগুলির ভরতুকি ব্যবস্থা সেরকম নয়। ঐসব পুঁজিবাদী দেশের ব্যবস্থায় ভরতুকি শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের মালিকদেরই, অর্থাৎ, বিক্রেতাদেরই দেওয়া হয়, যার জোরে তারা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগী অন্য রাষ্ট্রের পণ্যের থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে নিজেদের পণ্য বেচতে পারে। শক্তিমান দেশগুলিতে অসংখ্য কৌশল ও জটিল পথে এই ধরনের ভরতুকি দেওয়া হয়ে থাকে। এই পথেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ একচেটিয়া পুঁজির জন্য বিশ্ববাজারে বাণিজ্যের ভাগ বাড়াবার চেষ্টা করে গেছে। আমেরিকা, ইউরোপ, জাপানের অর্থনীতিতে এই ভরতুকি ব্যবস্থা ব্যাপক স্থান অধিকার করে আছে। এর ফলে 'মুক্ত বাজার' ও 'মুক্ত বাণিজ্য' ব্যবস্থা যে একটি মস্তবড় প্রহসন, তা ক্রমেই প্রকটভাবে ধরা পড়েছে।

১৯৬৪ সালে গ্যাট-এর ষষ্ঠ বৈঠক কেনেডি রাউন্ডে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এরপর শুল্ক হ্রাস করার প্রশ্নে এক একটি পণ্য ধরে বিচার করার পরিবর্তে গ্যাট 'গ্রুপ অফ গুডস্' বা এক জাতের যাবতীয় পণ্যকে একসাথে ধরে শুল্ক হ্রাসের হার স্থির করবে। কেনেডি রাউন্ডে আরও বলা হয়েছিল যে, অ-শুল্কের বাধাকে পরিমাপের মধ্যে এনে তা দূর করার জন্যও গ্যাট উদ্যোগী হবে। বলা বাহুল্য, 'মুক্ত বাণিজ্যে'র এই সব ঘোষণা কাগজে কলমেই থেকে গিয়েছে।

গ্যাট-এর 'মুক্ত বাণিজ্য' ব্যবস্থা যে কতবড় প্রহসন, তা সপ্তম বৈঠক টোকিও রাউন্ড (১৯৭৩-৭৯) চলাকালীন একেবারে নগ্ন হয়ে গিয়েছিল। টোকিও রাউন্ডে যখন বিশ্ববাণিজ্যে অ-শুল্কের বাধা বিলোপ করার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল, তখনই ১৯৭৪ সালে গ্যাট-এর বাইরে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি বস্ত্র আমদানি-রফতানি

বাণিজ্য বিষয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে একটি পৃথক বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, যার নাম multi-fibre agreement বা বহুতন্তু চুক্তি। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি তাদের দেশে বস্ত্র আমদানির উপর 'কোটা' নির্ধারণ করে দিয়েছিল। হস্তচালিত বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এশিয়ার অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া দেশগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বেশী। দক্ষ ও সস্তা শ্রমের জন্যই তারা আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে। তাই এইসব দেশ থেকে বস্ত্র রফতানিকে আটকাবার জন্যই 'কোটা' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল — যা স্পষ্টতই একটি অ-শুল্ক বাধা এবং গ্যাট-এর সিদ্ধান্তের বিরোধী। ফলে, 'উন্নয়নশীল' দেশগুলি বহুতন্তু চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি ঘোষণা করে যে, বস্ত্র বাণিজ্য (textiles) গ্যাট-এর বাইরে থাকবে ; অর্থাৎ, বস্ত্র আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে গ্যাট বিধি প্রয়োগ হবে না। একইভাবে বস্ত্রকে GSP ব্যবস্থা মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বস্তুতঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে 'মুক্ত বাণিজ্য' ব্যবস্থা এবং অপরদিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে 'শৃঙ্খলা' প্রতিষ্ঠার নামে যা যা করা হয়েছে, তা অনিবার্যভাবে শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির একচেটিয়া লগ্নী পুঁজির স্বার্থেই কাজ করেছে, যদিও তার দ্বারা তারা না তাদের পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের প্রশমন ঘটাতে পেরেছে, না বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের সংকটের নিরসন হয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণের বাণিজ্য আয়ের বৈষম্য

বিশ্ববাণিজ্যে ধনী ও দরিদ্র পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে আয়ের বৈষম্য কি নিদারুণ রূপ নিয়েছে, তার পরিচয় দিয়ে ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসংঘের মানবসম্পদ বিকাশ রিপোর্টের সংকলক ডঃ মহবুল উল হক বলেন যে, বিশ্ববাণিজ্য থেকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে দরিদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে আয়ের ব্যবধান গত তিন দশকে ১৫০ গুণ হয়েছে। এই বৈষম্যকে 'ভয়াবহ' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, আয়ের এই ব্যবধান, যা কোন একটি দেশের অভ্যন্তরে মেনে নেওয়া হত না, তাকেই বিশ্বের ক্ষেত্রে নীরবে সহ্য করা হচ্ছে। (Income disparities between the world's richest and the poorest have widened considerably over the last three decades, reaching a dangerous high level of 150 times. What would be considered politically and socially unacceptable within nations, is being quietly tolerated at the global level. — Dr. M.V. Haq —

Economic Times, 24.4.92) এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে চমকপ্রদ হারে। ১৯৯১ সালের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের মোট শক্তির (Energy) ৭৫ শতাংশ ধনী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে ব্যবহৃত হয় ; একইভাবে ব্যবসায়িক জ্বালানির ৮০ শতাংশ, কাঠের তৈরী জিনিসের ৮৫ শতাংশ ও ইস্পাতের ৭২ শতাংশের ভোগ হয় বিশ্বের উত্তর গোলার্ধের ধনী রাষ্ট্রগুলিতে। আংটাড (UNTACD)-এর হিসাবে বিশ্বের মোট উৎপাদনের (GDP) ৮২ শতাংশ কুক্ষিগত হয়ে আছে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির হাতে, অর্থাৎ ঐসব রাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজির দখলে। বিস্ময়ের হলেও সত্য যে, বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২৬.৮ শতাংশের মালিক হচ্ছে বিশ্বের শীর্ষ ২০০ টি বহুজাতিক কোম্পানী। এদের মধ্যে মার্কিন (৬০), জাপানী (৫৪), জার্মান (২১), ফরাসী (২৩) ও ব্রিটিশ (১৪) কোম্পানীর সংখ্যাই হচ্ছে ১৭২ টি। অথচ, বিশ্বের মোট ৫০০ কোটি জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ, অর্থাৎ ১০০ কোটির মত মানুষ বাস করেন উত্তর গোলার্দ্ধের রাষ্ট্রগুলিতে।

এই বিশাল আর্থিক শক্তির ফলে ঐসব দেশের ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের জীবনধারনের মান উন্নত হচ্ছে, ঘটনা আদৌ তা নয়। বরং সম্পদের কেন্দ্রীভবন, যা ঐসব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে দ্রুতহারে ঘটছে, তার ফলে সমাজের উপরতলায় প্রাচুর্যের বিপরীতে নীচের তলায় হাহাকার বাড়ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের দেওয়া হিসাবই বলছে, ১৯৭৭ থেকে ১৯৯০-এই ১৩ বছরে আমেরিকার উপরতলার মুষ্টিমেয় ৫ শতাংশের আয় বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, আর একেবারে নীচুতলার ২০ শতাংশ মানুষের আয় ক্রমাগত কমছে। (দি স্টেটস্‌ম্যান, ১৭.২.৯৪) পুঁজিবাদী বিশ্ববাজারে মন্দার ফলে বিপুল উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না, লুঠ করা প্রাকৃতিক সম্পদেরও অপচয় ঘটছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার অর্থ হচ্ছে, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাব। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী নিষ্ঠুর শোষণে শুধুমাত্র গত এক দশকেই ('৮০-'৯০) বিশ্বে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ কোটি ২০ লক্ষে পৌঁছেছে। এটা আংকটাডের দেওয়া ১৯৯১ সালের হিসাব এবং দরিদ্র বলতেও দেশে দেশে কেবল সরকারী দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষদেরই ধরা হয়েছে। কাজেই প্রকৃত দরিদ্রের সংখ্যা আরও বেশি।

শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির হাতে বিশ্বের সম্পদের ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভবন প্রমাণ করেছে যে, 'মুক্ত বাণিজ্য' 'অবাধ প্রতিযোগিতা'র নামে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রবলতর প্রতাপশালী একচেটিয়া লগ্নী পুঁজিরই

দাপট ও আধিপত্য কায়েম হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজি মার খেয়েছে। এর ফলেই পুঁজিবাদী দুনিয়া আবার পুঁজির শক্তির তারতম্যে উত্তর ও দক্ষিণ — এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। উত্তর গোলার্ধের সবল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে দক্ষিণ গোলার্ধের দুর্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি জোট বেঁধে বিশ্বের সম্পদের ভাগ দাবী করেছে ; 'নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' (New Economic Order) গড়ে তোলার দাবী জানিয়েছে। দুর্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াতেই নিজেটি মঞ্চ, জি-১৫, জি-৭৭ গড়ে তুলেছে ; রাষ্ট্রসংঘের আওতায় আংকটাডের মত সংস্থা গঠন করেছে। কিন্তু এর দ্বারা দুর্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতের মত আপেক্ষিক শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজি কিছু কিছু সুবিধা আদায়ে সক্ষম হলেও, বাকী অধিকাংশ দুর্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই কিছু পায়নি। পরিণামে শক্তিমান ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্যাট ক্রমেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছিল।

আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাধান্য

লক্ষণীয় যে, উরুগুয়ে রাউন্ডের আগে গ্যাট সম্পর্কে কোন গুরুতর আলোচনা, পর্যালোচনা শোনা যায়নি। কারণ, ইউরোপে ছাড়াও বিশ্বের সদ্য স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজারে প্রবেশের জন্য গ্যাটকে যেভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিকল্পনা করেছিল, তা বাস্তবে তেমনভাবে সম্ভব হয়নি। যে কারণেই শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিশ্বকে লুণ্ঠনের পরিকল্পনায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষতঃ আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্ক মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

গ্যাট-এর লক্ষ্য ছিল বিশ্বে পুঁজিবাদী বাজারের প্রসার ঘটানো। আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কেরও সেটাই লক্ষ্য। গ্যাট যা 'অবাধ' বাণিজ্যের নামে করার চেষ্টা করেছে, আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্ক তা ঋণদান ব্যবস্থার দ্বারা করতে চেয়েছে। আমেরিকা মার্শাল প্ল্যানের মধ্য দিয়ে ইউরোপকে ডলার সাহায্য দিয়েছিল যাতে ঐ ডলার দিয়ে তারা মার্কিন পণ্য আমদানি করে। এটা ছিল মার্কিন অর্থনীতিকে মন্দার বিপদ থেকে রক্ষা করার একটি উপায়। একইভাবে আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কও অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ঋণ দিয়েছে, যাতে সেই ঋণের অর্থ দিয়ে তারা শক্তিমান

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি থেকে অবাধে আমদানি করে। এজন্য আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থা, বিশেষতঃ আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের প্রধান শর্ত হচ্ছে, যারা ঋণ নেবে, তাদের অবাধ আমদানিসহ উদার আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে হবে, স্বদেশের অর্থনীতিতে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের দরজা উন্মুক্ত করে দিতে হবে। অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণও তাদের শিথিল করে দিতে হবে। বিশেষ করে বিদেশী লগ্নী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হওয়ার পথে বাধা অপসারণ করতে হবে। আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের বক্তব্য হচ্ছে, মুক্ত আর্থিক, শিল্প ও বাণিজ্য নীতির দ্বারাই এসব দেশের অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করা যাবে এবং একমাত্র ঐ পথেই ঋণের সদ্ব্যবহার করা ও সুদের টাকা নিয়মিত মিটিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ফলে, আই এম এফ-এর ঋণ ও 'মুক্ত দ্বার নীতি' পরস্পর অচ্ছেদ্য শর্তে আবদ্ধ। অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির শর্তও কম-বেশী একই ধরনের।

কিন্তু এই পথে পুঁজিবাদী বাজার সংকটের সমাধান করা যায়নি ; বরং ঋণের চাপ বিপরীত দিক থেকে বিশ্ববাজারের সংকটকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলির মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি ডলার। প্রতি বছর ৬ থেকে ৮ শতাংশ হারে এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, কোন অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশই 'মুক্ত অর্থনীতি'র দাওয়াই দিয়ে অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারেনি ; বিশ্ববাজারে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির আধিপত্য ভেঙ্গে নিজেদের রফতানি আয় বাড়াতে পারেনি। তদুপরি, পুঁজির শক্তিতে দুর্বল হলেও, 'উন্নয়নশীল' রাষ্ট্রগুলিও শ্রেণীচরিত্রে পুঁজিবাদী।

এইসব রাষ্ট্রগুলিতেও উৎপাদন ব্যবস্থা সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত হয় ; শোষণ, চুরি-দুর্নীতি, লুঠ ইত্যাদি যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য এইসব দেশগুলিতেও পুরোমাত্রায় বর্তমান। ফলে, তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও তার সঙ্গে শোষণের নীতির পরিণামে ঋণ মেটাতে ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়ায় বিশ্বের দুর্বলতর বহু পুঁজিবাদী দেশের ঋণের পরিমাণ তাদের জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশী হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি আফ্রিকার জায়রে (Zaire) নামের রাষ্ট্রটির আই এম এফ সদস্যপদ বাতিল হয়ে গিয়েছে। তারা আই এম এফ ঋণ আর পাবে না। কারণ, যা ঋণ তারা নিয়েছে, তার সুদ মেটানোর ক্ষমতাই তাদের আর নেই। এখন, এই সংকট যেমন ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রের, তেমন বিশ্ব পুঁজিবাদেরও সংকট। কারণ, ঋণের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী বাজার প্রসারের পরিকল্পনাও এর ফলে মার খাচ্ছে। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির পণ্য রফতানির বাজার শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই পুঁজিবাদী 'বিশেষজ্ঞরা' এখন ঋণ মকুব করা দরকার

বলে জোরালো অভিমত দিচ্ছেন ; না হলে মন্দার প্রকোপ কাটানো যাবে না, পুঁজিবাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হবে না। তাই বাজার প্রসারিত করার জন্য একদফা ঋণ মকুব করার ও আরও ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব তোলা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের ঋণদান নীতির মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পণ্যের রফতানি বাজার প্রসারের জন্য যে চেষ্টা চালিয়েছে, সেটাও অনেকখানি মার খেয়েছে। এর ফলে সত্তরের দশকের পর থেকে বিশ্ব পণ্যবাণিজ্যের বৃদ্ধির হার ক্রমাগত হ্রাস পায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পুঁজিবাদী বিশ্ববাণিজ্য বছরে ৭.৫ শতাংশ হারে বেড়েছিল, সত্তর-আশির পর্যায়ে বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮ শতাংশ। তারপর ১৯৮০ সালে বিশ্ববাণিজ্য বৃদ্ধির হার ছিল ১ শতাংশ। অবশেষে ১৯৮১ সালে তা প্রায় শূন্যে পৌঁছে ছিল। (অন দি ইকনমিক ক্রাইসিস অফ ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটালিজম — পি পট্টনায়েক, পৃঃ-১৯১)

১৯৮০ সাল থেকেই বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আবার মন্দার করাল ছায়া প্রসারিত হতে শুরু করেছিল। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি, ব্যাপক বেকারী, কলে-কারখানায় ছাঁটাই, আর তৃতীয় বিশ্বের দুর্বলতর দেশগুলির ব্যাপক ঋণগ্রস্ততা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ — এই হচ্ছে আশির দশকের চিত্র। আবার, এই সময়েই শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে — যা মন্দার প্রকোপ তীব্রতর করে তুলেছে। 'প্রযুক্তি বিপ্লবে'র নামে পুঁজিবাদী পন্ডিতরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'বিজয়' ঘোষণা করেছেন, অথচ সেই প্রযুক্তিই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাজার সংকটকে তীব্র করে দিয়েছে। **১৮৪৮ সালেই কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ নিজের উৎপাদন, বিনিময় আর সম্পত্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে ভোজবাজীর মত বিপুল উৎপাদন ও বিনিময়ের উপাদানগুলি গড়ে তুলেছে ; কিন্তু এই সমাজের অবস্থা সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলে, তা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।'** অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনের দ্রুত হারে বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেই হারে বাজারের প্রসার ঘটাতে পারেনি। ফলে, অতি উৎপাদন ও মন্দার সংকট শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে স্থায়ী রূপ নিয়েছে। ১৯৩০-এর মহা-মন্দার আতঙ্ক ফিরে এসেছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে।

এই সংকটের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি আরও তীব্র হয়েছে। এই পর্যায়ে মার্কিন অর্থনীতির আপেক্ষিক ক্ষয় ও শ্লথগতির পাশাপাশি পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের তুলনামূলক শক্তিবৃদ্ধি — বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান — এই তিন শক্তির মধ্যে তীব্র বাণিজ্য বিরোধের জন্ম দিয়েছে।

মার্কিন অর্থনীতির আপেক্ষিক ক্ষয় এবং জাপান ও জার্মানীর উত্থান

১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস্ সম্মেলন পুঁজিবাদী দুনিয়ার মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় ডলারকে মানদন্ড হিসাবে স্থাপনা করেছিল। ফলে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে ডলারের বিপুল চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ ডলার দিয়ে ইউরোপ মার্কিন পণ্য আমদানি করেছে। ফলে, মার্কিন বাণিজ্যে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত ঘটেছে। কিন্তু পাশাপাশি বিশ্বজোড়া ডলারের বন্যায় আর একটি সংকটের ছায়া তখনই পড়তে শুরু করেছিল। 'সমাজতন্ত্র'কে রোখার নামে বিদেশে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলতে, নানা 'মিত্র' দেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক তথাকথিত 'সাহায্য '(aid) দিতে, বিভিন্ন দেশে নিজস্ব গোষ্ঠী সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত দেশের নির্বাচিত সরকার ফেলে দিতে, প্রতিবিপ্লবী ভাড়াটে বাহিনী দিয়ে অন্য দেশের উপর আক্রমণ চালাতে এবং 'পুতুল সরকার'গুলি টিকিয়ে রাখতে মার্কিন শাসকরা দেদার ডলার ব্যয় করেছে। তদুপরি, 'মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা'র সুবাদে মার্কিন পুঁজি তখন লাতিন আমেরিকায় তো বটেই, এমনকি ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও সমানে অনুপ্রবেশ করেছে। ডলার তখন যেহেতু বিশ্বে এক নম্বর মুদ্রা, তাই বিপুল ডলারের চাহিদা মেটাতে আমেরিকা দেদার ডলার ছাপিয়েছে। ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি সেদিন ডলারের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল, কারণ আমেরিকা যেমন অর্থনৈতিক শক্তিতেও শীর্ষে ছিল, তেমনই সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসক-শোষকদের স্বার্থে সমগ্র বিশ্বে প্রতিবিপ্লবী পান্ডার ভূমিকা পালন করার ক্ষমতাও একমাত্র আমেরিকারই ছিল। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে ডলার ছড়ানোর ফলে আমেরিকার ব্যালান্স অফ পেমেন্টস-এ ঘাটতি দেখা দেয়। ডলার সংকটে পড়ে। ১৯৭১ ও ১৯৭৩ সালে মার্কিন শাসকরা দু'দুবার ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটায়। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থায় আবার পরিবর্তন ঘটাতে হয়। ডলার

মানদন্ডের ভূমিকা হারায়। ১৯৭৩ সাল থেকে বিশ্বে ভাসমান মুদ্রাবিনিময় হার (ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট) চালু করা হয়।

পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যেও আমেরিকার অবস্থান দিনে দিনে দুর্বল হচ্ছিল। কারণ, উৎপাদন বৃদ্ধির হারে, এমনকি উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত ঔৎকর্ষেও আমেরিকা সবক্ষেত্রে তার শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৫০ সালে বিশ্বের শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মোট উৎপাদনে আমেরিকার ভাগ ছিল ৪৭ শতাংশ। ১৯৮০ সালে তা ৩৭ শতাংশে নেমে যায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে ইউরোপের ১০টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র (EEC) ও জাপানের উৎপাদন যোগ করলেও তা আমেরিকার উৎপাদনের ৮০ শতাংশের বেশী হত না। কিন্তু ১৯৮৫ সালে তা আমেরিকার মোট উৎপাদনের থেকে ২০ শতাংশ (১২০%) বেশী হয়ে যায়। ১৯৯৩ সালে পণ্য রফতানিতে আমেরিকার মোট ঘাটতি ১০৬ মিলিয়ন ডলার ; এবং একমাত্র জাপানের সঙ্গেই ঘাটতির পরিমাণ ৫৫ বিলিয়ন ডলার। অপরদিকে জাপানের মোট বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ হচ্ছে ১০৮ বিলিয়ন ডলার।

কিন্তু জাপান ও জার্মানীর উত্থানের অর্থ এই নয় যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আমেরিকা তার সার্বিক নেতৃত্ব হারিয়েছে। পরিবর্তন যা ঘটেছে তা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সত্তর দশক পর্যন্ত বিশ্বের রফতানি বাজারে মার্কিন কোম্পানীগুলির যে নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল, তা বহু ক্ষেত্রেই জার্মানী ও বিশেষতঃ জাপানী কোম্পানীগুলির প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। এই ঘটনা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসম বিকাশেরই একটি ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। ১৯১৬ সালে লেনিন পুঁজিবাদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন। 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' বইতে ব্রিটেনের আপেক্ষিক পতন ও জার্মানীর উত্থানের প্রসঙ্গ আলোচনায় লেনিন বলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ কলকারখানা, শিল্পের বিশেষ বিশেষ শাখা ও এমনকি বিশেষ বিশেষ পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে অসম ও বিক্ষিপ্ত (uneven and spasmodic) বিকাশ অনিবার্য। ইংল্যান্ড, যাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বের 'ওয়ার্কশপ' ও মুক্ত বাণিজ্যের স্বর্গ বলা হত, সারা দুনিয়ায় শিল্প দ্রব্য রপ্তানিতে যে দেশ শীর্ষে ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ডের সেই অবস্থান মার খেতে সুরু করেছিল। কারণ, অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, ঐ সময় 'রক্ষণমূলক' শুল্কের সুবিধা নিয়ে উঠে দাড়িয়েছিল। (সমগ্র রচনাবলী - খন্ড ২২-পৃষ্ঠা ২৪১) ১৯৫২ সালে যখন জার্মানী ও জাপান মার্কিন প্রভুত্বে কার্যতঃ পদানত, তখনই কমরেড স্ট্যালিন

বলেছিলেন, "এই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা আছে কি যে, জার্মানী ও জাপান আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবে না ? মার্কিন বন্ধন ভেঙ্গে নিজেরা নিজেদের মত স্বাধীন হয়ে উঠবে না ? আমি মনে করি, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তার অর্থই হচ্ছে, পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতা বহাল থাকছে।" (... "What guarantee is there, then, that Germany and Japan will not rise to their feet again, will not breakout of American bondage and live their own independent lives ? I think there is no such guarantee. But it follows from this that the inevitability of war between capitalist countries remains in force." — J. V. Stalin : Economic Problems of Socialism in USSR)

১৯৫২ সালে স্ট্যালিনের ঐ বক্তব্যই অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে জাপান ও জার্মানী, মার্কিন পুঁজির সহায়তায় নিজ নিজ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে, তারাই এখন বিশ্ববাজারে আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আমেরিকার সার্বিক প্রাধান্য যা ছিল, তাতে ক্ষয় ধরেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন পুঁজিবাদের প্রাচুর্য, যা ইউরোপ ও জাপানের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনর্গঠনে সাহায্য রেছে, তা আজ অনেকটাই নেই। এর ফলে সংকট কেবল মার্কিন অর্থনীতিই দেখা দিয়েছে, তা নয় ; আজও মার্কিন পুঁজিবাদ বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে, যার সংকটের ধাক্কা ইউরোপীয় ও জাপানী পুঁজিবাদের উপর পড়তে বাধ্য এবং তা পড়েছেও।

জাপানের অর্থনৈতিক প্রবল ক্ষমতা বাজার সংকট থেকে মুক্ত নয়। অর্থনীতিতে মন্দার চাপ কাটাতে সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঢালছে। তবুও মন্দা যাচ্ছে না। জার্মানী সহ ইউরোপের প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে বেকার বাড়ছে। জার্মানীর নেতৃত্বে ইউরোপ জোট বেঁধে নিজেদের বাজার সংকট কাটাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সেখানেও জোটভুক্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটছে। ইউরোপের সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র স্ব-ইচ্ছায় বা খুশী মনে ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছে, তা নয় ; সেখানেও বাধ্যতা কাজ করছে।

ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থার ব্যর্থতা

জাপান বা জার্মানীর একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নী পুঁজিগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত উদ্বৃত্ত পুঁজির পরিমাণ যত বাড়ছে, ততই তার লাভজনক বিনিয়োগের জন্য বিশ্ববাজারের চাহিদাও তাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ; তা বিক্রির জন্যও প্রসারিত বাজারের খোঁজ চলছে। কিন্তু বাজার সেই হারে প্রসারিত হয়নি ও হচ্ছেও না। ফলে মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারী এখন আমেরিকার সাথে সাথে ইউরোপ ও জাপানেও স্থায়ী হয়েছে এবং তা ক্রমাগত বাড়ছে। পাশাপাশি লগ্নী পুঁজি ক্রমাগত স্ফীত হয়ে এক বিপুল আকার নিয়েছে, উদ্বৃত্ত পুঁজির সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে সহস্রগুণ। এই পরিস্থিতি ব্রেটন উড ব্যবস্থার সর্বাত্মক ব্যর্থতাই প্রমাণ করেছে। আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক ও গ্যাট — এই তিনটি সংস্থার সাহায্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে পুঁজিবাদী বাজার প্রসারিত করার পরিকল্পনা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আমেরিকার কাছে বিশ্ববাজারের প্রয়োজনটা ছিল তার উদ্বৃত্ত পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগের জন্য। **পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত পুঁজি জনগণের স্বার্থে শিল্প ও কৃষির বিকাশ ঘটিয়ে জনজীবনের মান উন্নত করার জন্য বিনিয়োগ হয় না ; তার একমাত্র লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা — যা একমাত্র শ্রমজীবী জনগণকে উত্তরোত্তর শোষণের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে।** তাই পুঁজিবাদের দ্রুততম ও ব্যাপক অগ্রগতির মধ্যেও অর্থনীতির অসম বিকাশ এবং জনজীবনে নিদারুণ দারিদ্র্য ও হাহাকার অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যরূপে বিরাজ করে — যেটাই আবার পুঁজিবাদী বাজার সংকটকে তীব্রতর করে দেয়।

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত গভীর সংকটের আবর্তেই নিমজ্জিত হোক, পুঁজিবাদ সংকটের চাপে আপনা-আপনি ভেঙ্গে পড়বে না। বরং, নিত্য নতুন কৌশলে অথবা পুরানো ফর্মূলাকেই নেড়ে-চেড়ে পুঁজিবাদ তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করবে। তার ফলে জনজীবনে শোষণ-অত্যাচারের তীব্রতাই বৃদ্ধি পাবে। সত্তরের দশক থেকে পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, বিশেষতঃ আমেরিকায় নানা অর্থনৈতিক ফর্মূলা ও তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু পুঁজিবাদ কোন কিছুর দ্বারাই বাজার সমস্যার মৌলিক সংকটের সমাধান করতে পারেনি। ফলে, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী স্বার্থের সংঘাতকে প্রশমিত করা যায়নি ; তার তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকা ক্রমাগত মন্দা, বাণিজ্য

ঘাটতি ও বেকারীর সংকটে পড়ে অবশেষে 'মুক্ত বাণিজ্যে'র পুরানো হাতিয়ারকেই তুলে নিয়েছে। মার্কিন অর্থনীতির সংকটের জন্য ইউরোপ ও জাপান ও অন্যান্য বাজারে সংরক্ষণকেই আমেরিকা দায়ী করেছে এবং সংরক্ষণ ভেঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করার দাবী তুলেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী দুনিয়ায় আমেরিকার কথাই শেষ কথা — এই পরিস্থিতিটা ইতিমধ্যে পুরোপুরি না হলেও অনেকটা বদলে যাওয়ার ফলে শুধু কথায় কাজ হয়নি। আমেরিকা পাল্টা চাপের ব্যবস্থা হিসাবে তার নিজস্ব বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারাকে কাজে লাগিয়েছে। মার্কিন প্রশাসন ঘোষণা করেছে, জাপান ও অন্যান্য দেশের বাজারে মার্কিন পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবেশ ও অবাধে লাভজনক ব্যবসায় বাধা দেওয়া হচ্ছে ; তাই ৩০১ ধারার বলে আমেরিকা তার নিজের বাজারে ঐ সব দেশের রফতানিতে বাধা বসাবে। আর, সুপার ৩০১ ধারার বলে অন্য দেশে মার্কিন প্রযুক্তি রফতানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমেরিকার বুকে জাপ-বিরোধী জিগির তোলা হয়েছে। জাপ-মার্কিন বিরোধ থেকেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন প্রশান্ত মহাসাগরে জ্বলে উঠবে বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যম মন্তব্য করেছে। ইউরোপের সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও কড়া সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে মার্কিন শাসকরা একথাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, হয় 'বাণিজ্য সমঝোতা' না হয় যুদ্ধ — দুয়ের একটি বেছে নিতে হবে। এই সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েই আমেরিকা আবার গ্যাট বৈঠকের আহ্বান জানায়। মার্কিন পুঁজির সঙ্গে জাপান ও ইউরোপীয় পুঁজির স্বার্থের চূড়ান্ত সংঘাত আছে ; আবার বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলকেন্দ্র হচ্ছে আমেরিকা — যার সঙ্গে জাপান ও ইউরোপের অচ্ছেদ্য বন্ধনও রয়েছে। সর্বোপরি, মার্কিন সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাবার ক্ষমতা ইউরোপ ও জাপান এখনও অর্জন করেনি। এই পটভূমিতেই ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে গ্যাট-এর অষ্টম বৈঠক বা উরুগুয়ে রাউন্ড শুরু হয়েছিল।

উরুগুয়ে রাউন্ড ও ডাংকেল খসড়া

সুতরাং, ব্রেটন উড ব্যবস্থার ভাঙ্গন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামগ্রিক বাজার সংকট এবং তাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের তীব্রতাবৃদ্ধি, বিশেষতঃ মার্কিন-জাপান স্বার্থের সংঘাত — এগুলিই উরুগুয়ে বৈঠক ডাকার আশু কারণ ছিল। ১৯৮৬ সালে উরুগুয়ে বৈঠকের সূচনা ও ১৯৯৪ সালে নতুন গ্যাটের চূড়ান্ত স্বাক্ষরের মাঝের আট বছরে বিশ্ব অর্থনীতি রাজনীতিতে আর

একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে যায়। পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে গরবাচভ-ইয়েলৎসিন চক্রের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রে পুঁজিবাদ পুরোপুরি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে, বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজার ভৌগোলিক দিক থেকে বিস্তার লাভ করে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে, সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে তীব্রতর হয়। বিশেষতঃ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির বাজারের ভাগ নিয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। জাপানী পুঁজি বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে অনুপ্রবেশের যে চেষ্টা চালাচ্ছিল, তারও গতিবৃদ্ধি পায়। বিশ্ব বাজারে আধিপত্যকে কেন্দ্র করে মার্কিন-জাপান দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে, গ্যাট-এর মধ্য দিয়ে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বোঝাপড়ার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছিল।

এই সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের সমাধানসূত্রই তদানীন্তন গ্যাট চেয়ারম্যান আর্থার ডাংকেল তার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে হাজির করেন। সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের মূলে রয়েছে বাজার ভাগাভাগি। সূচনাতেই আমরা বলেছিলাম যে, সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 'মুক্ত বাণিজ্য' বনাম 'সংরক্ষণের' নামে যে লড়াই দেখা দেয়, তা আসলে দুনিয়ার লুঠের বাজার ভাগ নিয়ে লড়াই। (. . . "it is not a fight between free trade and protection, ... but between two rival imperialists, two monopolies, two groups of finance capital" — Lenin : Imperialism the highest stage of capitalism. C.W. Vol-22, p-290)

সাম্রাজ্যবাদের স্তরে একচেটিয়া পুঁজি গোষ্ঠীগুলি বা কার্টেল ও সিন্ডিকেটগুলির মধ্যে একই সঙ্গে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা কাজ করে। প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই (নিজ নিজ রাষ্ট্রের একচেটিয়া লগ্নী পুঁজির প্রতিনিধি রূপে) উদ্বৃত্ত পুঁজি ও পণ্যের জন্য বিশ্বে বাজার প্রসার করতে চায়, কাঁচামাল ও সস্তা মজুরের উৎসগুলিতে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায়। বাজারের এই উদগ্র চাহিদা থেকেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে ; অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পুঁজির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীকরণ চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার ফলে একচেটিয়া কোম্পানী বা ট্রাস্ট ও কার্টেলগুলির পক্ষে বিশ্ববাজারের পরিমাপ করাও সম্ভব হয়। যার ভিত্তিতে বাজারের ভাগ নিয়ে তারা পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে তুলতে পারে। এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে 'শান্তিপূর্ণভাবে' বাজার ভাগ করে নেওয়ার

চেষ্টাও তারা চালায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা 'শান্তিপূর্ণ' থাকেনা এবং থাকতে পারেও না। কারণ, **লগ্নী পুঁজির আন্তর্জাতিক ঐক্যের ভিত্তিতে বিশ্বকে নতুনভাবে ভাগ করে নেওয়ার যে কোন সমঝোতাই করা হোক, তাতে ভাগের অনুপাত নির্ধারিত হয় 'পুঁজির জোর' ও 'শক্তির অনুপাতে'। এই শক্তির অনুপাত পুঁজিবাদী অসম বিকাশের কারণে এক জায়গায় স্থির থাকে না বলেই, সমঝোতা ভেঙ্গে যায়, তার স্থান নেয় সংঘর্ষ।**

বাজার ভাগাভাগির আবার একটা সমঝোতা গড়ে তোলার জন্যই গ্যাটকে বেছে নিয়ে উরুগুয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর পুঁজির জোর ও শক্তির অনুপাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, ইতিমধ্যে তা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছে। ফলে কেবল মার্কিন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে উরুগুয়ে বৈঠকে বাজার ভাগাভাগির যেসব সমঝোতা প্রস্তাব হাজির করা হল, তা ইউরোপ ও জাপানকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতন ঘটেছিল, ও সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাঙ্গনও সুরু হয়েছিল। ফলে জাপান ও ইউরোপকে 'সোভিয়েট জুজু'র ভয় দেখানোর পুরানো হাতিয়ারটিও আমেরিকা হারাচ্ছিল। কিন্তু আবার এটাও ঘটনা যে, বাজার ভাগাভাগি নিয়ে 'শান্তিপূর্ণ' সমঝোতা যেমন আমেরিকা চাইছে, তেমনই জাপান, ফ্রান্স, জার্মানীও চাইছে। তাদের মধ্যে বিরোধ ঘটছে ভাগের অনুপাত নিয়ে। শ্রমবিভাজন ও বাজারের সকল ক্ষেত্রে বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগী ক্ষমতা ও স্বার্থ একরকম নয়। সর্বোপরি বিপুল উৎপাদন শক্তি ও উদ্বৃত্ত পুঁজির তুলনায় বিশ্ববাজার সীমিত। তাই উরুগুয়ে বৈঠকে, কৃষি ও পরিষেবাকে যুক্ত করে 'মুক্ত বাণিজ্যে'র যে প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে মার্কিন পুঁজির স্বার্থের একাধিপত্য অন্যরা মেনে নিতে রাজী হয়নি। তাই আর্থার ডাংকেল এমন একটি সমঝোতা দলিল রচনার দায়িত্ব নিলেন যাতে মার্কিন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েও তা মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

এই উদ্দেশ্যেই ১৯৯০ সালে প্রাক্তন চেয়ারম্যান আর্থার ডাংকেল, আর আলোচনা না চালিয়ে একটি খসড়া দলিল রচনার প্রস্তাব দেন ও তা গৃহীত হয়। ডাংকেল সাহেব স্বয়ং সেই খসড়া দলিলটি তৈরি করে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তা পেশ করে বলেন যে, '৯২ সালের মধ্যে ঐ খসড়ার উপর সদস্য দেশগুলি মতামত দেবে, তারপর

ঐ খসড়া চূড়ান্ত আইনে পরিণত হবে। ডাংকেল সাহেবের প্রস্তাবগুচ্ছের নাম দেওয়া হয়েছিল চূড়ান্ত আইনের খসড়া (Draft Final Act)।

ডাংকেল খসড়ার মুখবন্ধেই শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল যে, খসড়াকে একটি 'প্যাকেজ' হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। তাই কোন একটি বিষয়ের উপর পৃথকভাবে সম্মতি জানালে চলবে না ; সম্মতি বা অসম্মতি পুরো 'প্যাকেজ'-এর উপরই জানাতে হবে। ("No single element of the Draft Final Act can be considered as agreed, till the final package is agreed".) এই শর্তের মধ্য দিয়ে বাস্তবে বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে একটি সমঝোতার বাধ্যতার মধ্যে বাঁধবারই চেষ্টা করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও '৯৩ সাল পর্যন্ত নতুন গ্যাট-এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া যায়নি। আর্থার ডাংকেল ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিরেকটার জেনারেল পদ থেকে অবসর নেন। তাঁর স্থানে আসেন পিটার সাদারল্যান্ড। সমঝোতার দলিল হিসাবে ডাংকেল খসড়াই বহাল থাকে। অবশেষে মার্কিন চাপেই ১৯৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে জেনিভায় ডাংকেল খসড়ার ভিত্তিতে নতুন গ্যাটে সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রাথমিক সম্মতি দেয়। তারপর ১৯৯৪ সালের ১৫ই এপ্রিল মারাকেশ শহরে এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গ্যাট '৯৪ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের আইনসভাকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার পর্যায় চলছে। এই প্রশ্নে ভারত সরকার পার্লামেন্টে কোন ভোটাভুটিতে রাজী হয়নি। সরকার জানিয়েছে, কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুমোদন করার সাংবিধানিক অধিকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভারই আছে ; সুতরাং ভারতের পার্লামেন্টের সম্মতির কোন প্রয়োজন নেই।

ডাংকেল খসড়া নিয়েও বিরোধ চলতে থাকায়, আমেরিকা যে হুমকি বা চাপ দিয়েছিল, তা হচ্ছে, '৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে যদি গ্যাট সদস্য অন্যান্য রাষ্ট্র খসড়ায় অনুমোদন না দেয়, তবে মার্কিন কংগ্রেস ডাংকেল খসড়ার প্রতিটি বিষয় ধরে ধরে পৃথকভাবে বিচার করে দেখবে যাতে মার্কিন স্বার্থের বিন্দুমাত্র কোন ছাড় না থাকে ; যার মর্মার্থ হচ্ছে, আমেরিকা আর কোন 'সমঝোতায়' যাবে না। শেষপর্যন্ত মার্কিন হুমকিতেই নতুন গ্যাট তৈরি হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মার্কিন পুঁজি বিশ্ববাজারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে খানিকটা পিছিয়ে পড়লেও, আজও পুঁজির জোর ও শক্তির অনুপাতে আমেরিকাই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শীর্ষে রয়েছে।

ডাংকেল খসড়ার বৈশিষ্ট্য

ডাংকেল খসড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা বিশ্ববাণিজ্যে মার্কিন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই এমন একটি দলিল তৈরি করেছিল, যা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

প্রথমতঃ বাণিজ্যের যেসব নতুন ক্ষেত্র ও নিয়মাবলী এইবার বিশেষতঃ মার্কিন স্বার্থে উরুগুয়ে বৈঠকের প্রস্তাবে তোলা হয়েছিল, সেগুলি বহাল রাখা হলেও, ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার যেসব বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে কিছুটা বোঝাপড়া করা হয়েছে। এর দ্বারা জাপানকে কোণঠাসা করার জন্য মার্কিন-ইউরোপ সমঝোতার ক্ষেত্র বিস্তার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতি শক্তিমান লগ্নী পুঁজির শোষণের সাধারণ স্বার্থে খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতকাল শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও কারিগরি সম্পর্ক এবং ঋণ ও সহায়তা'র ('aid') ঘনিষ্ঠ বন্ধনে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি বিদেশী পণ্য আমদানি ও বিদেশী কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষেত্রে নিজ নিজ জাতীয় বাজারকে সংরক্ষিত রাখার যে অধিকার গ্যাট আইনেই ভোগ করত, তা আর অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা পাবে না। শুধু তাই নয়, গ্যাট সদস্য সকল দেশের জন্য 'একইরকম বাণিজ্য আইন' তৈরির ফলে, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি বিশ্ববাজারে তাদের পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে গ্যাটের মধ্যেই কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা যা ভোগ করত, সেগুলিও আর থাকবে না। যেমন, GSP ব্যবস্থা অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ গ্যাট-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১) একটি স্থায়ী বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠন করা হবে। ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারী এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন গ্যাট আইন চালু হবে এবং তারপর গ্যাট নামে আর কিছু থাকবে না। স্থায়ী বাণিজ্য নিয়মাবলী রূপায়ণ করার দায়িত্ব নেবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। ২) বাণিজ্যবিরোধ মীমাংসার নানা নতুন নিয়মাবলী তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে cross retaliation ব্যবস্থা। যার অর্থ হচ্ছে, আমেরিকা যদি মনে করে যে, ভারতে মার্কিন কোম্পানীকে ঠিকমত পেটেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, তবে আমেরিকা বাণিজ্যের অন্য ক্ষেত্রে, যথা, পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করে ভারতের বিরুদ্ধে বদলা

নিতে পারবে। এই যে এক ক্ষেত্রের অভিযোগে অন্য কোন ক্ষেত্রে বদলা নিতে পারা, তাকেই বলা হচ্ছে cross retaliation ।এটা আগে গ্যাট-এ ছিল না। এটা হচ্ছে আমেরিকার ৩০১ ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গ্যাট-এর মুক্ত বাণিজ্যের শর্তাবলী ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মগুলি সকল সদস্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ এইসব নিয়মগুলির মধ্যে দিয়ে ডাংকেল সাহেব দেখিয়েছেন যে, মুক্ত বাণিজ্যের 'কঠিন' নিয়মাবলীর দ্বারা বিশ্ব বাজারে 'শৃংখলা' ও 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করাই যেন গ্যাট-এর লক্ষ্য ! তাই এমন একটি ধারণাও প্রচার করা হয়েছে, নতুন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্বে একটি 'কমন ফ্রি মার্কেট' বা 'সাধারণ মুক্ত বাজার' গড়ে তোলা হচ্ছে, যা ছোট-বড়, উন্নত-অনুন্নত সকল রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্বার্থেই কাজ করবে — যা বাস্তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা। একচেটিয়া পুঁজির বা সাম্রাজ্যবাদের যুগে 'মুক্ত বাজার' সর্বদা শক্তিমান একচেটিয়া পুঁজি ও ধনকুবের গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই কাজ করে। একথা প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জাতীয় বাজারের ক্ষেত্রে যেমন, বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের ক্ষেত্রেও তেমনই সত্য। বিশ্বের যে অঞ্চলে যত ধরনের 'কমন ফ্রি মার্কেট'-এর বোঝাপড়া আছে, সব কটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, জোটভুক্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান রাষ্ট্রের পুঁজির আধিপত্যই সেখানে কায়েম হয়েছে। যেমন ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে জার্মানী, এবং 'নাফতা'র ক্ষেত্রে আমেরিকা। তাই দ্বন্দ্বসংঘাত সেখানেও থাকতে বাধ্য এবং তা আছেও।

অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলির ভূমিকা

এখন, প্রশ্ন হচ্ছে, শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির স্বার্থে তৈরি নতুন গ্যাট আইন বিশ্বের অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলি মেনে নিল কেন ? যদি দেখা যেত, তারা পূর্বের মত জোট বেঁধে প্রতিবাদ করার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে, তবে একথা বলা সম্ভব ছিল যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বে মার্কিন খবরদারির দাপটের ফলেই অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলি লড়তে পারেনি, মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। উপরন্তু ভারত, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, নাইজিরিয়া ও কেনিয়ার মত রাষ্ট্রগুলির পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী যারা এতদিন বিশ্বে অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা নতুন গ্যাট

আইনকে স্বাগত জানিয়েছে। অথচ, নতুন গ্যাট আইনে অনুন্নত পুঁজিবাদী ('উন্নয়নশীল') দেশগুলিকে দুভাগে বিভক্ত করে ভারত বা ব্রাজিলের মত দেশের ক্ষেত্রেই জাতীয় বাজার সংরক্ষণ করার পূর্বেকার অধিকার বাতিল করা হয়েছে। যেসব পুঁজিবাদী দেশ শিল্পায়নে আরও পিছিয়ে আছে, তাদের বলা হয়েছে 'ন্যূনতম উন্নত' (least developing) এবং তাদেরকে বাজার খোলার শর্ত থেকে অনেক ক্ষেত্রে রেহাই দেওয়া হয়েছে। তবুও ভারতের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী নতুন গ্যাট আইনকে কেন স্বাগত জানিয়েছে, তার জবাব রয়েছে ভারত সরকারের উদার আর্থিক ও শিল্পনীতির মধ্যে। ডাংকেল খসড়া পেশ হওয়ার আগেই ভারতের শাসকশ্রেণী ভারতে বিদেশী লগ্নী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেজন্য অর্থনীতি ও বাণিজ্যের নানা ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানার বিলোপ ঘটিয়ে, একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যতঃ বিলোপ করে, শেয়ার বাজার মুক্ত করে দিয়ে, বিদেশী মুদ্রা আইন শিথিল করে ও অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে দ্রুত ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের নিয়মকানুন অনুযায়ী 'মুক্ত' করে দিতে সুরু করে। ভারতের শাসকশ্রেণীর আর্থিক ও শিল্পনীতির এই পরিবর্তনের পিছনে ভারতীয় পুঁজিবাদের সংকট ও তার সঙ্গে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ও বর্তমান বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য কাজ করেছে, যার সঙ্গে মিলিয়েই নতুন গ্যাটের তাৎপর্য ও ভারতের অর্থনীতিতে তার ফলাফল সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া সম্ভব। নতুন গ্যাট আইনকে ধরেই আমরা তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

নতুন গ্যাট আইন মোট ২৮টি আলাদা আলাদা চুক্তির সমষ্টি এবং অসংখ্য ধারা ও উপধারায় পূর্ণ। গ্যাট আইনের মূল চরিত্র ও তাৎপর্য বোঝার জন্য সকল ধারা-উপধারার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তাই নতুন গ্যাট আইনে বাণিজ্যের যেসব নতুন ক্ষেত্র যুক্ত করা হয়েছে এবং যেগুলিই নয়া গ্যাট-এর মূল বৈশিষ্ট্যরূপে সামনে এসেছে, সেগুলির মধ্যেই আমরা আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব। এই নতুন ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে — ক) কৃষি খ) ট্রিমস (TRIMs) গ) ট্রিপস, (TRIPs) ঘ) পরিষেবা (GATS) এবং (ঙ) বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন (WTO) ।

কৃষি সংক্রান্ত গ্যাট আইন

ভারত সরকার বলেছে, কৃষিকে এইবার গ্যাট-এর মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে নাকি ভারতের চাপেই। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার — যা ভারতের কৃষিজীবী জনগণকে বিভ্রান্ত করে ভারতের কুলাক-শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য বলা হচ্ছে। নতুন গ্যাট আইনে

কৃষিকে যুক্ত করা হয়েছে প্রধানতঃ মার্কিন লগ্নী পুঁজির প্রয়োজনেই। বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারসংকটের মূল আঘাত পড়েছে শিল্পপণ্যের উৎপাদনে। তদুপরি, শিল্পপণ্যের সীমিত বিশ্ববাজারে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলিকে জাপান ও ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়েছে। আমেরিকা তাই — বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি পূরণ করতে কৃষিপণ্য রফতানি বৃদ্ধির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই পথে উদ্বৃত্ত পুঁজি মার্কিন কৃষি-শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করাও তার লক্ষ্য। এই প্রশ্নে তার সঙ্গে প্রধান বিরোধ দেখা দিয়েছিল ইউরোপের শক্তিমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির ও জাপানের সঙ্গে। কারণ, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ইউরোপের কৃষিবাজারকে নানারকম সংরক্ষণের বেড়া দিয়ে এমনভাবে বেঁধে ফেলেছে যে সেখানে বাইরের কৃষিপণ্যের পক্ষে প্রতিযোগিতা করে বাজার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। জাপানের কৃষিবাজার, বিশেষতঃ চালের বাজারে আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আমেরিকা গ্যাট আইনের বাজার খোলার চুক্তির মধ্যে কৃষিপণ্যের বাজারকেও যুক্ত করে ইউরোপ ও জাপানের বাজারে মার্কিন কৃষিপণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার দাবী করেছে। কে কতটা কৃষিপণ্যের বাজার কিভাবে ও কত দফায় খুলবে, তা নিয়েই উরুগুয়ে বৈঠকে বিরোধ গড়িয়েছে এবং ডাংকেল খসড়া আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে বোঝাপড়ার একটি ফর্মূলা তৈরি করে দিয়েছে।

কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসা পুরোপুরি ডাংকেল ফর্মূলার ভিত্তিতেও হয়নি। ১৯৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর জেনিভার বৈঠকে মার্কিন ও ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে এক পর্যায়ের রুদ্ধদ্বার আলোচনার পরই ঘোষণা করা হয় যে, কৃষিবাজার নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিরোধের মীমাংসা যদি এতই সহজ ছিল, তা তবে সাত বছর ধরে গড়াল কেন ? ঐ গোপন বোঝাপড়ার বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তা তোলা হয়নি। লক্ষণীয় যে, কৃষিপণ্যে অশুল্ক বাধা (কোটা ব্যবস্থা) বিলোপ করে তার স্থানে কত ট্যারিফ বা শুল্ক বসানো যাবে, তা ডাংকেল ফর্মূলায় নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত চুক্তিতে তা বলা হয়নি। চূড়ান্ত চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, গ্যাট-এর আইন অনুযায়ী কোন্ দেশ কতটা শুল্ক, ভরতুকি কমাবে বা বসাবে, তা প্রতিটি দেশকে আলাদা করে 'প্রতিশ্রুতির তালিকা' (schedule of committments) হিসাবে গ্যাট-এ জমা দিতে হবে। ঐ তালিকা 'ন্যাশনাল সিডিউলস্' রূপে চূড়ান্ত গ্যাট আইনের সঙ্গে যুক্ত হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ঐ তালিকা গত ১৫ই ডিসেম্বর জমা দিতে হয়েছিল। ফলে বিশ্বের কৃষিপণ্যের বাজারে পরিস্থিতি কি দাঁড়াচ্ছে, সংরক্ষণ কোথায় কতটা থাকছে বা উঠছে — তা এখনও পরিষ্কার নয়।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড সরকারের এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, গ্যাট-এর কৃষিবাজার খোলার আইন-কানুনের কোন প্রভাব আমেরিকা বা ইউরোপের বাজারে পড়বে না। অর্থাৎ, আমেরিকা ও ইউরোপের কৃষিবাজার বাড়তি কিছু খুলছে না। (The Newzealand Institute of Economic Research said, "Clearly the strong resistance of protectionist forces to reform in the industrialised world is the major reason for the watering down of the (GATT) agreement." "This is particularly so on internal support measures where the European Union and the United States have to make no changes as a result of the Uruguay Round." Business Standard, 14.8.94))

তাহলে একথা বলা কি অমূলক যে, কৃষিবাজার খোলা নিয়ে গ্যাট আইনকে এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যাতে আমেরিকা বা ইউরোপকে তাদের বাজার তেমন খুলতে না হয় ; বরং তারা উভয়েই অন্য দেশের বাজারে প্রবেশ করতে পারে। অথচ, ভারত সরকার গ্যাট আইন স্বাক্ষর করার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি যেটা দেখাচ্ছে তা হচ্ছে, এর ফলে বিশ্বের বাজারে ভারতের কৃষিপণ্যের রফতানি নাকি হু হু করে বেড়ে যাবে। আর, 'রফতানি বৃদ্ধি মানেই দেশের উন্নয়ন' — এই তত্ত্ব প্রচার করে সরকার দেশের মানুষকে বোঝাচ্ছে যে, নতুন গ্যাট আইনের বলে ভারতের রফতানি বৃদ্ধি পেয়ে দেশের কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। রফতানি বাড়বে কি না, তা সবই অনুমান নির্ভর। তা ছাড়া রফতানি যদি বাড়েও, তার দ্বারা গ্রামীণ জীবনে মুষ্টিমেয় কৃষি পুঁজিপতিদেরই মুনাফার বৃদ্ধি ঘটবে ; কৃষিজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মানের কোন উন্নতি হবে না। বরং এর দ্বারা বৃহৎ জোত চাষের জন্য জমি মুষ্টিমেয়ের হাতে আরও কেন্দ্রীভূত হবে ; ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে ; রফতানিযোগ্য ও বাড়তি লাভজনক ফসল উৎপাদন করার দিকেই কৃষি উৎপাদন ধাবিত হবে। তার ফলে দেশের সাধারণ খাদ্যশস্যে টান পড়বে এবং ক্রমাগত তার মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। গ্রামীণ জোতদার ও সম্পন্ন চাষীদের জীবনযাত্রায় আরও চাকচিক্য ও আধুনিকীকরণের ছোঁয়া লাগবে ; অপরদিকে কোটি কোটি দরিদ্র কৃষিজীবী জনগণ, যারা কোনও না কোনওভাবে জমির সঙ্গে যুক্ত থেকে দিন গুজরান করছে, তাদের সেই সংস্থানও চলে যাবে। সুতরাং, রফতানি বৃদ্ধির হাতছানিতে শরদ যোশীর মত কুলাক-শ্রেণী আহ্লাদিত হতে পারে, কিন্তু ভারতের কোটি কোটি নিম্নমধ্যবিত্ত, গরীব চাষী, বর্গাদার ও ভূমিহীন

ক্ষেতমজুর জনগণের তাতে প্রলুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারত সরকার 'জাতীয় স্বার্থ' বলতে যাদের স্বার্থের ধ্বজা ওড়ায়, সেটি ভারতের শিল্প ও কৃষি পুঁজিপতিদের স্বার্থ, যা আজ মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় পরিণত হয়েছে।

অপরদিকে রয়েছে গ্যাট আইন অনুযায়ী ভারতের নিজস্ব কৃষিবাজার খোলার প্রশ্নটি। এবার গ্যাট আইনে উন্নয়নশীল বলে পরিচিত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে দুটি ভাগ করা হয়েছে। ভারত, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশগুলিকে বলা হয়েছে উন্নয়নশীল, আর খুব পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে বলা হয়েছে ন্যূনতম উন্নত। জাতীয় বাজার খোলার জন্য গ্যাট আইনের শর্তাবলী থেকে কেবলমাত্র ন্যূনতম উন্নত দেশগুলিকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, নতুন গ্যাট-এ কৃষিবাজার বিদেশী পণ্যের জন্য খুলে দিতে যেসব আইন করা হয়েছে, তা আপাতত ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, একটি 'উন্নয়নশীল' দেশ হিসাবে ১০ বছর নিজের বাজার বন্ধ রাখার সুযোগ ভারত পাবে। গ্যাট আইনে কৃষিক্ষেত্রে 'মুক্ত বাজার' চালু করার নিয়মগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে।

১। মার্কেট এ্যাকসেস বা বাজার খোলার ব্যবস্থা ঃ এই আইন অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, প্রথম ধাপে কৃষিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যাবতীয় অশুল্ক বাধা (যেমন, কোটা ইত্যাদি) তুলে দিয়ে, তার পরিবর্তে শুল্ক বসাতে হবে। এই শুল্কের নির্দিষ্ট কোন হার বলা হয়নি। দ্বিতীয় ধাপে ঐ শুল্ক দফায় দফায় হ্রাস করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিকে ৬ বছরে ৩৬ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ১০ বছরে ২৪ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করতে হবে। এটাকে দেখিয়েই বলা হচ্ছে, যা কিছু আমদানির বাধ্যতা, তা ভারতের ক্ষেত্রে দশ বছর পর দেখা যাবে। এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, এই আইনে আমদানি অবাধ করার আর একটি বিধান ১০ বছরের মধ্যেই চালু করতে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, অশুল্ক বাধা সরিয়ে শুল্ক বসানোর সময়ে, যেসব প্রাথমিক বা মূল কৃষিপণ্যের (basic products) আমদানির পরিমাণ, দেশে ঐ পণ্যের মোট যা ব্যবহার বা ভোগ হয়, তার ৩ শতাংশের কম, সেইসব পণ্যের উপর এমন স্বল্পহারে শুল্ক বসাতে হবে যাতে ঐসব পণ্যের আমদানি উপরোক্ত হিসাবে ১০ বছরের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ শতাংশ পরিমাণ হতে পারে। এর অর্থ বাধ্যতামূলক আমদানি না হলেও এটা যে আমদানি অবাধ করারই শর্ত, তাতে কোন সন্দেহ

নেই। এক্ষেত্রেও সরকার বলছে, এই বিধানও ভারতের ক্ষেত্রে আগামী ১০ বছরের মধ্যে প্রযোজ্য হবে না। কারণ, বিদেশী মুদ্রার সংকটজনিত সুবিধার সুযোগ পেয়ে ভারত আমদানির উপর আগামী ১০ বছরের জন্য 'কোটা' চালু রাখতে পারবে। অথচ ভারত সরকার নিজেই দাবী করছে যে, তাঁর বিদেশী মুদ্রার সংকট আর নেই।

২। ডোমেস্টিক সাপোর্ট বা আভ্যন্তরীণ সহায়তা ঃ এই বিধানের সঙ্গেই দেশের অভ্যন্তরে যাবতীয় ভরতুকি তোলার বিষয়টি যুক্ত। অর্থাৎ, দেশীয় উৎপাদনে ও পণ্যে সরকারি ভরতুকি দিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলি স্বদেশের ও বিদেশের বাজারে দেশীয় পণ্যের দাম কমিয়ে রেখে অপর দেশের পণ্য প্রবেশের পথে যে বাধা আরোপ করে থাকে, ভরতুকি তুলে দেওয়ার বিষয়টি এনে গ্যাট তা রদ করে বাজার খোলার ব্যবস্থা করেছে বলে দাবী করা হয়েছে। বাজারে পণ্যের দাম কম রাখার জন্য উৎপাদকদের যে 'ক্ষতি' হয়, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সরাসরি ভরতুকি দিয়ে উৎপাদকদের সেই 'ক্ষতি' পুষিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের ভরতুকি দু'ভাবে দেওয়া হয়। একটি হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রিক ভরতুকি (non-product specific), অপরটি হচ্ছে পণ্য ভিত্তিতে ভরতুকি (product specific)। এই ভরতুকি ব্যবস্থা ও তার পরিমাপ পদ্ধতিকে মিলিয়েই নাম দেওয়া হয়েছে এগ্রিগেট মেজারমেন্ট সাপোর্ট (AMS)।

গ্যাট আইনে বলা হয়েছে, কোন উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে পণ্য নিরপেক্ষ (non-product specific) ও পণ্যভিত্তিক (product specific) ভরতুকির পরিমাণ টাকার অংকে, সেই দেশের মোট কৃষি-উৎপাদনের যা মূল্য, তার যদি ১০ শতাংশের বেশি হয় (উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ), তবে ১০ শতাংশের উপরে তা যতটা বেশি, তার ১৩.৩ শতাংশ (উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ) ১০ বছরের (উন্নতদের ৬ বছরের) মধ্যে হ্রাস করতে হবে। ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, ভারতে কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকির পরিমাণ গ্যাট নির্দ্ধারিত সীমার অনেক নীচে।

ভারতের কৃষিতে ভরতুকি ব্যবস্থা

কৃষি প্রধান ভারতে কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকি দেওয়ার সরকারি বাধ্যতা ভিন্ন কারণে দেখা দিয়েছিল। ভারতে ব্যাপক জনগণের অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস

করেন, যাদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থান করাই সমস্যা। তার উপর আছে খরা-বন্যার প্রকোপ। ভারতের কৃষি উৎপাদনে বৃহৎ চাষী বা জোতদারদের পাশাপাশি ছোট ছোট জমিতে অসংখ্য নিম্নমধ্য, প্রান্তিক ও গরীব চাষীর জীবন জড়িত। ফসলের অভাবী বিক্রি এদের জীবনে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের রূপ নিয়ে অবস্থান করছে। এদের যা আয় তা দিয়ে উচ্চ মূল্যে কৃষি উপাদান ক্রয় করার বা উচ্চহারে বিদ্যুৎ ও সেচকর দিয়ে চাষ করা অসম্ভব।

এই পরিস্থিতি ভারতের মত একটি পুঁজিবাদী দেশেও সরকারকে বাধ্য করেছিল প্রথমতঃ কৃষিক্ষেত্রে সরকারীভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করতে; দ্বিতীয়তঃ ভরতুকি ব্যবস্থা ও খাদ্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে এবং তৃতীয়তঃ খাদ্যশস্যের রফতানি নিয়ন্ত্রণ করতে। আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদী বাজারের প্রয়োজনেই এগুলি করা হয়েছে।

ভারতে কৃষিতে ভরতুকি দুই প্রকারে দেওয়া হয়। একটি হচ্ছে, বিশেষ কিছু খাদ্যপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, যা এগ্রিকালচারাল প্রাইসেস কমিশন ঘোষণা করে। সরকার এই নির্দিষ্ট দামে বাজার থেকে বিশেষ কিছু খাদ্যপণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণে কিনে নিয়ে সরকারি ভান্ডার গড়ে তোলে — যার থেকে কিছুটা কম দামে সরকার রেশনে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে; খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে জরুরী সরবরাহে তা ব্যবহার করে। ঐ সহায়ক মূল্যের মধ্যে কৃষি উৎপাদকদের জন্য ভরতুকি ধরা থাকে; আর ধরা থাকে রেশনে প্রদত্ত খাদ্যের জন্য ভরতুকি।

ভারতে দ্বিতীয় রকম ভরতুকি কৃষি উপাদানের (input) উপর দেওয়া হয়। যথা — সার, সেচ, বিদ্যুৎ ও বীজ ইত্যাদি খোলা বাজারের থেকে কম মূল্যে কৃষিতে সরবরাহ করা হয়। তার সঙ্গে স্বল্প সুদে ঋণদান ব্যবস্থাও ভরতুকির মধ্যে পড়ে। কৃষি উপাদানে এই ভরতুকির সুযোগ নিয়ে বৃহৎ চাষীরা তাদের মুনাফা বাড়িয়েছে একথা যেমন ঠিক, তেমনি অগণিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর পক্ষে ঐ ন্যূনতম ভরতুকির সাহায্যে চাষে নিযুক্ত থাকাও সম্ভব হয়েছে। অবশ্য তার দ্বারা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জীবনে দারিদ্র্য তো ঘোচেইনি, বরং দফায় দফায় সার ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে সরকার এদের জীবনে নাভিশ্বাস ডেকে এনেছে।

ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, নতুন গ্যাট আইনে ভরতুকি তুলে দেওয়ার যে ধরনের শর্ত দেওয়া হয়েছে, তা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সরকার ভারতে ভরতুকির যে হিসাব দিচ্ছে, তা যদি সত্যও হয়, তাতেও ভারতের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আশ্বস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই, যেহেতু সরকারী ব্যয় সংকোচ ঘটাবার

নামে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ইতিমধ্যেই কৃষিতে ভরতুকি তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ; রেশনে চাল-গম-চিনির দাম বাড়িয়ে তার মূল্য প্রায় খোলা বাজারের স্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, নতুন গ্যাট আইনে খাদ্যশস্যের সরকারী সংগ্রহ ব্যবস্থাকেও 'মুক্ত বাণিজ্য বিকৃতকারী' ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যা দেওয়া ও তা বিলোপ করার কথা বলা হয়েছে। যদিও ভারতে খাদ্যশস্যের সরকারী সংগ্রহ ব্যবস্থা এখনই গ্যাট আইনের কোপে পড়ছে না, কিন্তু তার অর্থ ভবিষ্যতেও তা গ্যাট-এর ছাড়ের আওতাতেই থাকবে, তা নয়। কারণ, কৃষি সংক্রান্ত গ্যাট আইন ছয় বছরের জন্য চালু করা হয়েছে। তারপর নতুন পর্যালোচনার ভিত্তিতে তার পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ হবে।

ভারত সরকারের মন্ত্রীরা জোর গলায় বলছেন, দেশের মানুষকে খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব সরকারের, সেই কাজে সরকার কোন ব্যতিক্রম ঘটাবে না। কিন্তু জনসাধারণ দেখছেন যে, আই এম এফ-এর বিপুল ঋণ ও রাজস্ব ঘাটতি মেটাবার নামে সরকারী ব্যয়সংকোচের খড়্গ — আমাদের দেশে যতটুকু জনকল্যাণমূলক সরকারি কর্মসূচী ছিল, তার উপরেই পড়ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য — সকল ক্ষেত্রেই সরকার নিজ ন্যূনতম দায়িত্ব অস্বীকার করছে। তাহলে দরিদ্র জনগণকে খাওয়াবার সরকারী বক্তৃতা নিতান্ত বাগাড়ম্বর ও নিষ্ঠুর প্রতারণা ছাড়া কিছু হতে পারে না।

৩। এক্সপোর্ট প্রোমোশান বা রফতানি সহায়তা ঃ বিদেশের বাজারে কৃষি পণ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াবার জন্য যে রফতানি ভরতুকি দেওয়া হয়, নতুন গ্যাট আইনে তা হ্রাস করার বিধান নিয়ে আসা হয়েছে। নতুন আইনে বলা হয়েছে, রফতানি বৃদ্ধির জন্য উন্নত দেশগুলি তাদের কৃষিপণ্যে যা ভরতুকি দেয়, তার পরিমাণ ১৯৮৬-৮৮ সালে যা ছিল, ২০০১ সালের মধ্যে তার থেকে ৩৬ শতাংশ ভরতুকি কমাতে হবে। ঐ একই সময়ে ভরতুকিপ্রাপ্ত রফতানির পরিমাণ ২১ শতাংশ হ্রাস করতে হবে। আর, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ১০ বছরে রফতানিতে ভরতুকির পরিমাণ ২৪ শতাংশ ও ভরতুকিপ্রাপ্ত রফতানির পরিমাণ ১৪ শতাংশ হ্রাস করতে হবে। এই পথে কৃষিপণ্যের বিশ্ববাজারে 'মুক্ত প্রতিযোগিতা'র মধ্য দিয়ে যার যার ভাগ বুঝে নেওয়ার কথাই গ্যাট-এ বলা হয়েছে।

ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, ভারতীয় কৃষিপণ্যে যা রফতানি ভরতুকি দেওয়া হয়, তা পরিমাণে শক্তিমান দেশগুলির থেকে এমনিতেই কম ; তদুপরি তা হ্রাস করার জন্য দশ বছর সময় পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ছ'বছরেই শক্তিমান দেশগুলিকে

রফতানি ভরতুকি যা কমাতে হবে, তাতে বিশ্ববাজার অনেকটা 'মুক্ত' হয়ে যাবে, যার সুযোগে ভারত কৃষিপণ্যের রফতানি বাড়িয়ে নিতে পারবে। বস্তুতঃ, গ্যাট চুক্তির সমর্থনে ভারত সরকারের সকল বক্তব্যের মূলেই রয়েছে রফতানি বৃদ্ধির যুক্তি। এই যুক্তি কেবল গ্যাট-এর ক্ষেত্রেই নয়, ভারত সরকারের উদার আর্থিক ও শিল্পনীতি, আই এম এফ ঋণ, শিল্পের বেসরকারীকরণ, অবাধ আমদানি নীতি — সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারী প্রচারে মুখ্য করে দেখানো হচ্ছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী, বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ও কৃষি পুঁজিপতিদের একটা বড় অংশও সমস্বরে রফতানির কথাই বলছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ভারত সরকারের রফতানিমুখী আর্থিক ও শিল্পনীতির পরিপূরকরূপে গ্যাট চুক্তি এসেছে ; ফলে, ভারতের রফতানি বৃদ্ধির প্রয়োজনে গ্যাট-এর কোন বিকল্প নেই। যদি সত্যিই রফতানি বাড়ে তবে লাভ হবে শিল্প ও কৃষি পুঁজিপতিদের। তাদের মুনাফাবৃদ্ধির ব্যবস্থাকেই 'জাতীয় স্বার্থ' বলে প্রচার করা হচ্ছে। এজন্য এমনকি গ্যাট-এর পেটেন্ট সংক্রান্ত আইনকেও ভারত সরকার গুরুত্ব দিতে রাজি নয়।

শস্যবীজের পেটেন্ট ব্যবস্থা

কৃষি সংক্রান্ত গ্যাট আইনের উপরোক্ত তিনটি বিভাগ ছাড়াও শস্যবীজের পেটেন্ট সংক্রান্ত বিশেষ আইন আছে। গ্যাট-এর আলাদা আলাদা নানা চুক্তির মধ্যে 'মেধাস্বত্বের অধিকার' (intellectual property rights) নামে একটি পৃথক চুক্তি (ট্রিপস্) করা হয়েছে — যা পূর্বেকার গ্যাট-এ ছিল না। নতুন গ্যাট আইনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত এই কালা চুক্তিটি। শিল্প, কৃষি, পরিষেবার উৎপাদন ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আধুনিক গবেষণা থেকে শুরু করে যেখানেই ও যে ধরনের বিষয়েই ব্যক্তির বা কোম্পানীর নিজস্ব একচেটিয়া স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে, নতুন গ্যাট আইনে সর্বত্র সেই অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার অত্যন্ত মৌলিক এই ক্ষেত্রটিতে কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে মুক্ত বাণিজ্য নীতির কথা বলা হয়নি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা পরে যাব ; আপাতত কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শস্যবীজের স্বত্বের বিষয়গুলি সহজভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক প্রযুক্তি বর্তমানে কেবল শিল্পক্ষেত্রেই প্রয়োগ হচ্ছে, তা নয়। শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ক্রমাগত কৃষি-উৎপাদনবৃদ্ধির তীব্র প্রতিযোগিতায় কৃষিতেও ব্যাপকভাবে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে, নতুন নতুন শস্যবীজ উদ্ভাবন

করা, প্রচলিত শস্যের গুণমান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা, পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য আধুনিক কীটনাশক তৈরি করা, ইত্যাদি কাজে ব্যাপক আধুনিক গবেষণা ও তার প্রয়োগ ঘটছে। এইসব বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞান দুনিয়ায় বহুদূর এগিয়ে গেছে। বস্তুতঃ, কৃষিবিজ্ঞানের অগ্রগতি বর্তমানে যে স্তরে পৌঁছেছে, তাতে বিশ্বে খাদ্যসমস্যা থাকারই কথা নয়। তবুও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষে ও অনাহারে মারা যাচ্ছে ; কারণ, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাও পরিচালিত হচ্ছে পুঁজিবাদী সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে — জনসাধারণকে খাদ্য যোগানোর প্রয়োজনে নয়। একই লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার, রোবট ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতির মতই উন্নত ও আধুনিক প্রথায় শস্যবীজ, সার ও কীটনাশক উদ্ভাবন, তৈরি ও বিক্রির বিশাল বিশাল কোম্পানী গড়ে তোলা হয়েছে, যাদের কারবার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষি উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাজার সেই হারে প্রসারিত হচ্ছে না ; ফলে কৃষি পণ্যেও বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। যেখানে এক কোম্পানী অপর কোম্পানীকে টেক্কা দেওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের শস্যবীজ, সার ও কীটনাশকের উপর পেটেন্ট বা নিজস্ব স্বত্ব কায়েম করছে ; যাতে অন্য কোন কোম্পানী — তা নিজের দেশের বা অন্য দেশের কোম্পানী হতে পারে — ঐ উন্নত শস্যবীজ, সার বা কীটনাশক উদ্ভাবন করে তার বিশ্ববাজার কেড়ে নিতে না পারে। অর্থাৎ, বিশেষ বিশেষ শস্যবীজ, সার ও কীটনাশকের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ একচেটিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে কৃষিতে পেটেন্ট ব্যবস্থার মূল কথা। এই ব্যবস্থার দ্বারা শুধুমাত্র উদ্ভাবিত বীজ, সার বা কীটনাশকের উপর একচেটিয়া ব্যবসায়িক স্বত্ব কায়েম করা হচ্ছে, তা নয় ; উন্নত কৃষি উপাদান উদ্ভাবনের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়বে ধরে নিয়ে মার্কিন কোম্পানীগুলি আগে থেকেই অন্যান্য মৌল প্রাকৃতিক উপাদান, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহের বিশেষ বিশেষ জিনের উপর গবেষণা চালিয়ে, তার উপরও স্বত্ব কায়েম করে ফেলছে ; যাতে ঐসব মৌল উপাদানের উপর অন্য দেশে কোন গবেষণা পর্যন্ত হতে না পারে। এইভাবে বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীবজন্তু — যা বিশ্ব মানবজাতির সম্পদ, সেগুলির উপর শুধুমাত্র পুঁজির জোরে একচেটিয়া কব্জা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশেই মেধাস্বত্বের অধিকার সংক্রান্ত আইন আছে। এ বিষয়ে পৃথক আন্তর্জাতিক সংগঠনও আছে। কিন্তু ঐ সংগঠনের নিয়মকানুন বা

আন্তর্জাতিক সাধারণ নিয়মাবলী মেনে চলা, অথবা নিজস্ব পৃথক নিয়মাবলী চালু করার বিষয়ে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের নিজস্ব অধিকার ছিল — যার সাথে বহুপাক্ষিক সাধারণ বাণিজ্যচুক্তির কোন সম্পর্ক ছিল না। গ্যাট সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভারতের নিজস্ব পৃথক পেটেন্ট আইন ছিল। ভারতে কোন্ কোন্ বিষয়ে পেটেন্ট দেওয়া হবে এবং তা কি নিয়মে হবে প্রভৃতি ভারতীয় পেটেন্ট আইনে (১৯৭০) আলাদাভাবে বলা ছিল। যেমন, ভারতে কোন কৃষি উপাদান, বিশেষতঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন সংক্রান্ত কোন উপাদানে কোন কোম্পানীকে কোন স্বত্বাধিকার দেওয়া হত না।

কিন্তু নতুন গ্যাট আইনে 'মেধাস্বত্বের' অধিকারকে গ্যাট-এর বহুপাক্ষিক চুক্তির মধ্যে যুক্ত করে বলা হয়েছে যে, বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্বের একই রকম আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী প্রতিটি গ্যাট সদস্য রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হবে। এই মেধাস্বত্বের অধিকারের মধ্যে শস্যবীজের উপর স্বত্ব দেওয়ার কথা বলে হয়েছে। ডাংকেল ফর্মুলার প্যাকেজ শর্তটি এখানে স্মরণীয়। 'গ্যাটের কোন একটি চুক্তিকে পৃথকভাবে মানলে চলবে না' — এই শর্তের দ্বারা নির্দিষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, গ্যাট-এর বাজার ছাড়াছাড়ির বোঝাপড়ায় আমেরিকাকেও যদি শেষ পর্যন্ত কিছু ছাড়তেই হয়, তবে পেটেন্ট ব্যবস্থার সুবাদে আমেরিকা তার ক্ষতি পুষিয়ে নেবে, শুধু তাই নয়; আধুনিক প্রযুক্তির যেসব ক্ষেত্রে এখনও আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তাকে পেটেন্ট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে স্থায়ী করে রাখবে এবং তাকে ব্যবহার করে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে মার্কিন পুঁজির একচেটিয়া দখলদারি কায়েম করবে।

নতুন গ্যাট আইনে শস্যবীজের পেটেন্টের বিষয়ে যা যা বলা হয়েছে, তার মর্মার্থ হচ্ছে — ভারতের চাষীরা বিদেশী কোম্পানীর উন্নত শস্যবীজ কিনতে পারে, কিন্তু ঐসব উন্নত বীজের উপর গবেষণা করে ভারতে ঐ ধরনের বা তার থেকে উন্নত কোন বীজ অবাধে উদ্ভাবন করা যাবে না। তার জন্য বিদেশী কোম্পানীর অনুমতি চাই ; অনুমতি দিলেও তার মূল্য বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা রয়ালটি দিতে হবে। বিদেশ থেকে উন্নত বীজের নমুনা এনে তার উপর গবেষণা চালিয়ে উন্নত ধরনের বীজ তৈরির যে প্রথা ভারতে ও অন্যান্য বহু দেশেই চালু আছে, তা আর করা যাবে না। এমনকি একবার ব্যবহার করা বীজের শস্য থেকে বীজ তুলে রেখে, তা বিক্রি করা যাবে না। এককথায়, যা আইন করতে চাওয়া হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য — প্রথমতঃ, বিশাল বিশাল মার্কিন বীজ কোম্পানীগুলির জন্য বিশ্বে অবাধ বাজার তৈরি করা ; দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য দেশের কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতির রাশকে মার্কিন পুঁজির স্বার্থে নিয়ন্ত্রণে রাখা

— যাতে কৃষিপণ্যের বাজারে মার্কিন কোম্পানীগুলির নিরঙ্কুশ আধিপত্য ভবিষ্যতেও কায়েম রাখা যায়। কারণ, কৃষিতে পেটেন্ট ব্যবস্থা কেবলমাত্র শস্যবীজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়, 'প্লান্ট ভ্যারাইটিজ' বা উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এই উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বলতে সবরকম গাছগাছড়া বোঝানো হয় — যা সার থেকে কীটনাশকসহ কৃষি উৎপাদনের নানা আধুনিক উপাদানের ক্ষেত্রেই গবেষণার মধ্য দিয়ে কাজে লাগানো যায়। এর উপর পেটেন্ট অধিকার দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, বিশ্বের যে কোন দেশের প্রয়োজনীয় গাছ গাছড়ার নির্যাসের উপর বিদেশী কোম্পানীগুলি স্বত্ব কায়েম করে ফেলতে পারবে। যেমন, ভারতের কোন বিশেষ গাছগাছড়া সামান্য দামে কিনে নিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলি, তার উপর গবেষণা চালিয়ে কোন উন্নত সার বা কীটনাশক তৈরি করে, সেটাই বিপুল দামে সারা বিশ্বে, এমনকি ভারতেকেও আবার বেচতে পারবে। ভারতের বিজ্ঞানীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থাকলেও, ঐ বিশেষ নির্যাস থেকে অনুরূপ কোন বস্তু ভারতে তৈরি করা যাবে না। শুধু তাই নয়, ঐ বিশেষ নির্যাসের উপর নতুন গবেষণার অধিকার নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত রয়েছে।

সুই জেনেরি ব্যবস্থা

এই প্রসঙ্গেই গ্যাট আইনে বলা হয়েছে যে, গ্যাট সদস্য দেশগুলির শস্যবীজ ও গাছগাছড়ার ক্ষেত্রে হয় পেটেন্ট ব্যবস্থা, না হয় কোন 'কার্যকরী সুই জেনেরি (Sui Generis) ব্যবস্থা' চালু করতে হবে। এই সুই জেনেরি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধি রয়েছে — যা অনুসরণ করেই কোন দেশ আইন করতে পারবে। নতুন নতুন উন্নত বীজ বের করার জন্য গবেষণার অধিকার ও তা বিক্রির অধিকার কিরকম দেওয়া হবে, চাষীদের ক্ষেত্রে ঐ বীজ ব্যবহার করার কি ধরনের অধিকার দেওয়া হবে না হবে —সুই জেনেরি ব্যবস্থার মধ্যে তার নানারকম বিধান রয়েছে। অর্থাৎ, পেটেন্ট ব্যবস্থাই সামান্য ভিন্নরূপে সুই জেনেরি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আনা হবে।

গ্যাট আইনে মেধাস্বত্বের ধারার বিরুদ্ধে ভারতের বিজ্ঞানী ও গবেষকরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং তাতে সম্মতি না দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবী করেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার তাঁদের ঐ দাবীর প্রতি কর্ণপাত করেনি। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমে বলা হয়েছিল যে, পেটেন্ট অধিকার না দিলে বাইরের

প্রযুক্তি পাওয়া যাবে না ; আর তা না পেলে বিশ্ববাজারের উপযুক্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদন করা যাবে না, বিশ্বে ভারতীয় কৃষিপণ্য রফতানি করা যাবে না। ফলে, এতদিন পর্যন্ত ভারতের পেটেন্ট আইনে যা দেওয়া হয়নি, এখন সেই আইন পরিবর্তন করে খাদ্যশস্যের বীজে ও কৃষি উৎপাদনের উন্নতির সঙ্গে জড়িত সকল আধুনিক প্রযুক্তির উপর পেটেন্ট দিতে হবে। কিন্তু এর ফলে ভারতের নানা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বিদেশী কোম্পানীগুলির স্বত্ব কায়েম হবে, কৃষি উৎপাদন ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে, সাধারণ চাষী মারা পড়বে — এই সত্য নিঃসংশয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার পর ভারত সরকার দ্বিতীয় দফায় নতুন বক্তব্যে যা বলছে তা বিশেষ লক্ষণীয়। সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, সুই জেনেরি আইনের সুযোগে ভারতেও শস্যবীজ ও গাছগাছড়ার উপর স্বত্বাধিকারের নতুন আইন করা হবে — যার ফলে শস্যবীজের গবেষণা, উৎপাদন ও ব্যবসা ভারতীয় পুঁজিপতিদের কাছেও লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হবে। ফলে তারা শস্যবীজ শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করবে। বীজ ও গাছগাছড়ার গবেষণায় ভারতের কৃষিবিজ্ঞানীদের দক্ষতা আছে ও তার সঙ্গে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। দুইয়ে মিলে ভারতীয় পুঁজিপতিরা ব্যবসায় নামলে, তারা কেবল ভারতে নয়, ভারতের থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে বীজের ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা লুঠতে পারবে। এজন্য ভারত সরকার তড়িঘড়ি আইন রচনায় তৎপর হয়ে ইতিমধ্যেই তার খসড়াও বিলি করেছে। গ্যাট আইনে ভারতকে ১০ বছর সময় দেওয়া থাকলেও, ভারত সরকার ততদিন অপেক্ষা করতে রাজী নয়। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বীজব্যবসায় প্রভূত মুনাফালাভ করার এই সুযোগ ও স্বার্থকেই ভারত সরকার যথারীতি 'ভারতের সুযোগ' 'দেশের স্বার্থ' 'আমাদের স্বার্থ' ইত্যাদি ভাষায় এমনভাবে হাজির করছে, যেন এই পেটেন্ট ব্যবস্থা ভারতের লক্ষ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর স্বার্থেই করা হচ্ছে — যা আদপেই সত্য নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেধাস্বত্বের অধিকারের নামে কৃষিতে যে পেটেন্ট ব্যবস্থা, বিশ্বের অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ বা সস্তা কাঁচামালের উপর সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির শোষণের কব্জা কায়েম করার জন্যই গ্যাট আইনে যুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে ভারত সরকার ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার স্বার্থসিদ্ধি করার পথ দেখতে পাচ্ছে। এটাই হচ্ছে বিশ্বের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা তাকে সাম্রাজ্যবাদী গ্যাট আইনের সমর্থকে পরিণত করেছে।

এখন, বিশ্ববাজারে ভারতীয় কৃষিপণ্যের রফতানিবৃদ্ধির যে সম্ভাবনার কথা ভারত সরকার বলছে, তাও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কারণ, আমেরিকা ও ইউরোপের কৃষিপণ্যের বাজারে ভরতুকি হ্রাস পাওয়ার ফলে বাজার 'মুক্ত' হওয়ার 'আশা' অসংখ্য 'যদি' ও 'কিন্তু'র উপর নির্ভরশীল। কারণ, গ্যাট আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পণ্যের উল্লেখ না করে সকল প্রকার ভরতুকির মোট যোগফলের উপর নির্দ্ধারিত হারে মোট ভরতুকি হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে। ফলে, কোন দেশ মোট ভরতুকির পরিমাণ ঠিক রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী কোন পণ্যে বেশি, কোন পণ্যে কম ভরতুকি দিতে পারে। তাই কোন্ পণ্যে ভরতুকি কমানো হবে, আর কোথায় তা থাকবে, কিংবা আরও বেড়ে যাবে — তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ, ভারতের কোন্ কৃষিপণ্য বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারবে, তা আজও অনিশ্চিত। আমাদের দেশে যেমন চিনি-লবি, তুলা-লবি, গম-লবি ইত্যাদি আছে, শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও তা কাজ করে। সেখানে কোন্ লবি চাপ দিয়ে তার পণ্যে ভরতুকি বহাল রাখতে পারবে, আর কোন্ লবি মার খাবে, তা এখনই বলা অসম্ভব। সুতরাং, শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি ভরতুকি আদৌ কমাবে কিনা, অথবা কমানো হলেও তা কি হারে কমবে এবং তার ফলে বিশ্ববাজারে বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের দাম কি দাঁড়াবে — সমস্ত বিষয়টাই এখনও অন্ধকারে।

কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি আমদানিকারক দেশকে বিপদে ফেলবে

তবে, বিশ্ববাজারে কোনও না কোনভাবে ভরতুকি হ্রাস পেলে, তার পরিণামে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। ফলে বিশ্বের যেসব 'ন্যূনতম উন্নত' দেশকে খাদ্যশস্যের জন্য পুরোপুরি বা অনেকখানি আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়, তাদের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে বিদেশী মুদ্রার সংকট তীব্রতর হবে। এই পরিণাম ধরে নিয়েই নতুন গ্যাট ব্যবস্থায় আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্ককে যুক্ত করে বলা হয়েছে যে, খাদ্যশস্যের আমদানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল (net food importing countries) দেশগুলিকে খাদ্য আমদানির জন্য আই এম এফ যেন বিদেশী মুদ্রা ঋণ দেয়। অর্থাৎ, শুধুমাত্র খাদ্য আমদানির প্রয়োজনেই বিশ্বের দুর্বল দেশগুলির জনগণের গলায় বিদেশী ঋণের ফাঁস আরও শক্ত হয়ে বসবে। এই কারণেই শক্তিমান দেশগুলির কৃষিপণ্য রফতানির জন্য দুর্বলতর দেশগুলির বাজার খোলাবার জন্য পৃথক চাপ

দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। তারা এমনিতেই আমদানি করতে বাধ্য। অর্থাৎ, ন্যূনতম উন্নত দেশগুলিকে কৃষিপণ্যের বাজার খোলার শর্ত থেকে ছাড়া দেওয়ার মধ্যে শক্তিমান দেশগুলির কোন বদান্যতা নেই।

বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে বিশ্বের দুর্বল দেশগুলি যখন বিপদ দেখছে, ভারতের কৃষি পুঁজিপতিরা তখন কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য পাওয়ার সম্ভাবনায় আহ্লাদিত। ভারত সরকারও কৃষিসংক্রান্ত গ্যাট আইনের সমর্থনে একদিকে রপ্তানি ও তার সাথে কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য লাভ করার যুক্তি দিচ্ছে। কিন্তু অনিশ্চিত বিশ্ববাজারে ভবিষ্যতে ভারতীয় কৃষি পুঁজিপতিদের জন্য উচ্চ মুনাফার সুযোগ যদি দেখাও দেয়, তবে তার দ্বারা ভারতের সাধারণ মানুষ তথা কৃষিজীবী গরীব চাষীমজুরের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না। বরং একদিকে রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদন যত বাড়তে থাকবে, তত দেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে বেশি বেশি ঘাটতি দেখা দেবে এবং সেই ঘাটতি মেটাবার জন্য বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে খাদ্য আমদানি করতে হবে ; ফলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়তেই থাকবে এবং দৈনন্দিন খাদ্যশস্যও দরিদ্র জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। এই হচ্ছে ভারতের জনজীবনে কৃষিসংক্রান্ত গ্যাট চুক্তির অনিবার্য ভবিষ্যৎ ফলাফল — যা কোন সরকারী মিথ্যাপ্রচার দিয়ে আড়াল করা যাবে না।

তাহলে কৃষিসংক্রান্ত নতুন গ্যাট আইন থেকে দুটি দিক পাওয়া গেল। প্রথমতঃ, শিল্পপণ্যের বাণিজ্যে মার খেয়ে আমেরিকা বিশ্বে কৃষিপণ্যের বাজার প্রসারিত করার জন্য মরিয়া হয়েই কৃষিপণ্যে মুক্ত বাজার দাবী করেছে এবং সেজন্যই নতুন গ্যাট আইনে কৃষিপণ্য বাণিজ্যকে যুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মার্কিন স্বার্থসিদ্ধির এই উপায়ের মধ্যে ভারতের কৃষিপুঁজিপতিশ্রেণী তাদের স্বার্থ পূরণ করার পথ দেখতে পাচ্ছে। এজন্য ভারতের কৃষিক্ষেত্রেও বিদেশী পুঁজি টানার জন্য ভারতে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।

বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ও অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলির ভূমিকা

ভারত সরকারের উদার আর্থিক ও শিল্পনীতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে, ভারতে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ প্রশস্ত করা এবং বিদেশী পুঁজির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববাজারে ভারতীয় শিল্প ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির এই ভূমিকাই ভারত সরকারকে গ্যাটের পরিষেবা ও বিদেশী

কোম্পানীর মুক্ত ব্যবসা (ট্রিমস্) সংক্রান্ত শর্তগুলির প্রতি সমর্থনে বাধ্য করেছে। ভারতের অর্থনীতিতে বিদেশী লগ্নী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ উদার করে দেওয়ার যে রাস্তা ভারতের শাসকশ্রেণী গ্রহণ করেছে, বিশ্বের অন্যান্য বেশ কিছু অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশ তা আগেই গ্রহণ করেছে। শিল্পায়নের দিক থেকে অনুন্নত এইসব স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলি ইতিপূর্বে, শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির লগ্নীপুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নিজেদের জাতীয় বাজারকে যতটা সম্ভব সংরক্ষিত রেখে, বিশ্ববাজারের ভাগ নিয়ে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দর কষাকষি করার যে নীতি নিয়ে চলছিল, বিদেশী লগ্নী পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই নীতির ইতিমধ্যে অনেকটাই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

সত্তরের দশকের মধ্যভাগে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারে আর এক দফা মন্দার তীব্র প্রকোপ দেখা দেয় যার ধাক্কা শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতিতে প্রবলভাবে পড়েছিল। মন্দার চাপে তখন আমেরিকা, ইউরোপের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কোম্পানীগুলির (ট্রান্সন্যাশানাল করপোরেশন) পরস্পরের মধ্যে বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি তীব্রতর হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ও সস্তা শ্রমের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ও মুনাফার হার বৃদ্ধির জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। যেহেতু শক্তিমান উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকের মজুরির হার অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি, সেহেতু সস্তা শ্রমের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির দিকে তারা নজর দেয়। কিন্তু এইসব অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুরানো ঔপনিবেশিক কায়দায় প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করে শোষণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিদেশী লগ্নী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও সংরক্ষণের নানা বাধানিষেধ ছিল। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কোম্পানীগুলি তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে কলকারখানা তুলে এনে তা অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে, তাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে মেনেই, স্থাপন করতে শুরু করে। আধুনিক শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিল্প পরিকাঠামো অপরিহার্য বলেই আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলি, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সেই সব দেশকেই বেছে নিয়েছে, যেসব পুঁজিবাদী দেশে স্বাধীনতার পর কিছুটা শিল্পায়ন হয়েছে ও শিল্পভিত্তি গড়ে উঠেছে এবং একইসঙ্গে সস্তায় দক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীও যেখানে পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনায় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, অনুন্নত স্বাধীন দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে যৌথ কারবার গড়ে তোলার

উপরই প্রধানতঃ জোর দিয়েছে ; তাতে সংরক্ষণকে টপকে পুঁজি বিনিয়োগ করা সহজ হয়েছে।

শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজির এই অনুপ্রবেশের বিরোধিতার পরিবর্তে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসক জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সাধারণভাবে তাকে স্বাগত জানিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এইসব অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি পুঁজি, প্রযুক্তি ও আভ্যন্তরীণ বাজারের অভাবে নিজ নিজ দেশে আকাঙ্খিত শিল্পায়ন ঘটাতে পারেনি ; যার ফলে বিশ্ববাজারে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির শক্ত প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়ানোর জন্য এদের প্রচেষ্টা ও বাসনা মার খেয়েছে। অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি জোট বেঁধে বিশ্ববাজারের ভাগ পাওয়ার জন্য শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যে লড়াইটা করেছে, তার দ্বারা তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে সমর্থ হলেও, বিশ্ববাজারে ভাগ বাড়াতে পারেনি।

এই পরিস্থিতিতে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজি তীব্র বাজার সংকটে পড়ে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কলকারখানা স্থানান্তরিত করার পথ নেওয়ায়, ঐসব দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিশ্ববাজারে ভাগ পাওয়ার বাসনা চরিতার্থ করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং তাকেই শিল্পায়নের পথ রূপে গ্রহণ করেছে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে উদার শিল্পনীতি। এর ফলে, শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির লগ্নী পুঁজি অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সস্তা শ্রম ও সস্তা কাঁচামাল লুঠ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে। **এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বহু দেশ, যারা স্বাধীন ও পুঁজিবাদী অর্থে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, তাদের জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কোম্পানীর যৌথ কারবার এইসব দেশের জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের একটি নয়া রূপ হিসাবে দেখা দিয়েছে।** এর ফলে, শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলির বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর উপর চাপ সৃষ্টি করাও সহজ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিবাদের সম্পর্ক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্বতন উপনিবেশগুলির মধ্যে ভারতের পুঁজিবাদ শুরু থেকেই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। পরাধীন ভারতেই একচেটিয়া পুঁজি

জন্ম নিয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছিল। শক্তিশালী ভারতীয় একচেটে পুঁজির নিজস্ব বিকাশের পথে ব্রিটিশ পুঁজি বাধা সৃষ্টি করছিল বলেই, ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল। স্বাধীনতার পরও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিবাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই থেকেছে।* এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতেই ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী গ্যাট-এর সদস্যপদ নিয়ে বিশ্ববাজারের ভাগ পাবে বলে আশা করেছিল। ভারতের পুঁজিবাদী শিল্পায়নে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ব্যাপক সহায়তা পাওয়ারও আশা করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতকে দ্রুত একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি আশানুরূপ সহায়তা দেবে না — একথা বুঝেই ভারতের শাসকশ্রেণী বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্যে নিরপেক্ষতার ভাণ করে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক দুই শিবিরের কাছ থেকেই ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশের স্বার্থে সহায়তা আদায়ের পথ গ্রহণ করেছিল। এটাই ছিল পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির দ্বন্দ্বের ভিত্তি। অন্যদিকে দেশে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দিতে ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বিভিন্ন একচেটে পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাজার দখলের প্রতিযোগিতার উপর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার জন্য পুঁজিবাদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। মিশ্র অর্থনীতির নামে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর অধীনে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে ভারতের পুঁজিবাদ শিল্পায়নের পথে পা বাড়িয়েছিল। এই পথে ভারতীয় পুঁজিবাদ যতটা শিল্পায়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, সেটাই তাকে আভ্যন্তরীণ বাজার সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

---

* "Under the influence of the United States and the World Bank, the Industrial Credit & Investment Corporation of India, was registered as a joint stock company on 14 March 1955, and besides the Govt. of India, the US, UK, West German, French and Japanese interests have participation in its share capital. The genesis of the setting up the ICICI was that the International Finance Corporation, an affiliate of the World Bank, wanted an institution for lending finances to the Indian private corporate sector, and through this mechanism the Indian Private Corporate Sector has established linkages with world monopoly capitalism." Indian Capitalism : Competition & Collaboration with World Monopoly Capitalism— C. P. Bhambri.

বেকারি, অর্ধ-বেকারি, বিপুল করের বোঝা, মূল্যবৃদ্ধি, প্রকৃত আয়ের অবনমন ও বিশাল গ্রামীণজীবনের নিদারুণ দারিদ্র্যের ফলে জনগণের অতি সামান্য ক্রয়ক্ষমতার পরিণামে আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্রমসংকোচন ঘটে এবং তার ফলে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী দেশের বাইরে, বিশেষতঃ নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অন্যান্য অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বাজার খুঁজতে শুরু করে। ষাটের দশকেই ভারতীয় পুঁজি মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বাজারে রপ্তানি হয়েছে। ভারতীয় পুঁজিবাদ ব্যাঙ্কপুঁজি ও শিল্পপুঁজির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে লগ্নী পুঁজির জন্ম দিয়েছে এবং তা বিদেশে রপ্তানি করার মধ্য দিয়ে নিজেই সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অর্জন করেছে।

ভারত সরকারের উদার আর্থিক ও শিল্পনীতি

কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজারও মুক্ত নয়। শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সেখানেও প্রতিযোগী। অন্যদিকে সীমিত বাজারেই প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াতে ভারতেও পুঁজির কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়ায় একচেটিয়া পুঁজির স্ফীতি ঘটেছে — যারা আভ্যন্তরীণ বাজার সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাজারে বৃহত্তর ভূমিকা নিয়ে নামতে চায়। কিন্তু সেখানে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে ভারতে ধীরে ধীরে উদার আমদানি নীতি চালু করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তি আমদানির নামে ঐ উদার নীতি ভারতে বিদেশী মুদ্রার তীব্র সংকট ডেকে আনে — যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভারতের শাসকশ্রেণী আই এম এফ থেকে বিপুল ঋণ গ্রহণ করে। একদিকে ঋণের শর্ত ও অপরদিকে আধুনিক প্রযুক্তির জন্য ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলির চাহিদা — এই দুই কারণে ভারতে উদার আর্থিক ও শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয়। এই উদার আর্থিক ও শিল্পনীতির মূল কথা হচ্ছে, শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির লগ্নীপুঁজির ভারতে প্রবেশ অবাধ করে দেওয়া এবং তার সঙ্গে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির যৌথ কারবার গড়ে তোলা।এই নীতিই ১৯৯১ সালে নয়া শিল্পনীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই বিশ্ববাজারে তার নিজের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াবার তাগিদে ভারতের অর্থনীতিতে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজিকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ও তার মধ্য দিয়ে ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবী জনগণকে দেশীয় পুঁজির সঙ্গে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির শোষণের শিকারে পরিণত করে দিচ্ছে।

কিন্তু বিশ্বের অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি যেহেতু নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী শিল্পায়নের তাগিদেই বিদেশী পুঁজিকে ডেকে এনেছে, তাই দেশীয় পুঁজির স্বার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীগুলির কারবারের উপর ইতিপূর্বে তারা নানা বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করেছে যাতে সব মুনাফাই পাচার হয়ে না যায়। এজন্য প্রধানতঃ বিদেশী কোম্পানীর উৎপাদনে দেশীয় পণ্য (intermediaries) ব্যবহার করার উপর জোর দেওয়া ; বিদেশী কোম্পানীগুলি রপ্তানির মধ্য দিয়ে যা বিদেশী মুদ্রা আয় করে, তা যাতে বিদেশী পণ্য আমদানির নামে পুরোটাই তারা হেডকোয়ার্টারে চালান না করতে পারে, তার জন্য বিদেশী মুদ্রা ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিছু কড়াকড়ি করা প্রভৃতি সংরক্ষণ ব্যবস্থা কম-বেশি সকল স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশই অনুসরণ করে থাকে। ভারতেও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে নানা সংরক্ষণ আরোপিত ছিল। এই ধরনের সংরক্ষণ বা বিধিনিষেধকেই নতুন গ্যাট আইনে 'মুক্ত বাণিজ্যের বিরোধী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং 'ট্রিমস্'-এর নিয়মাবলী তৈরি করা হয়েছে সেগুলির অপসারণ করার জন্যই।

ট্রিমস্ বা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থা

'ট্রিমস্' বা 'ট্রেড রিলেটেড ইনভেস্টমেন্ট মেজার্স' চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, বিদেশী কোম্পানীগুলির ব্যবসার উপর নানা দেশে যেসব বাধানিষেধ আরোপ করা হয়, তা অবাধ বিনিয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। সুতরাং গ্যাটসদস্য দেশগুলিকে তা তুলে দিতে হবে।

এই প্রশ্নে প্রধান শর্ত হচ্ছে 'ন্যাশানাল ট্রিটমেন্ট'। যার অর্থ হচ্ছে — দেশের মধ্যে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ব্যবসার সকল সুযোগসুবিধা দেশীয় কোম্পানীর মতই দিতে হবে। দেশীয় ও বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে ব্যবসার আইনকানুনের কোন পার্থক্য করা চলবে না। বিশ্ববাণিজ্য 'মুক্ত' করার নামে গ্যাট আইনের 'ন্যাশানাল ট্রিটমেন্ট'-এর শর্তকে প্রাথমিক বা মূল শর্ত বলা যায় ; যার দ্বারা কৃষি, শিল্প, পরিষেবা, মেধাসত্ত্ব প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিদেশী একচেটিয়া কোম্পানীগুলির অবাধ ব্যবসার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কোম্পানীর বিনিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মকানুনকে বলা হয় 'ইনভেস্টমেন্ট মেজার্স'। তার সঙ্গে 'ট্রেড' কথাটা যুক্ত করে দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, এই চুক্তির দ্বারা বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ অবাধ করার জন্য বলা হচ্ছে না ; শুধুমাত্র বিদেশী কোম্পানীগুলির পণ্য ব্যবসার বিষয়ে দেশীয় বিধিনিষেধ শিথিল করতে বলা হচ্ছে।

ট্রিমস্ চুক্তিতে বিদেশী কোম্পানীকে দেশীয় কোম্পানীর মর্যাদা দেওয়ার শর্তের সঙ্গে মিলিয়ে বলা হয়েছে, কোন বিদেশী কোম্পানীকে একথা বলা যাবে না যে, দেশীয় পণ্য ব্যবহার করলে তবেই ঐ কোম্পানী দেশীয় কোম্পানীর সমান সুযোগ পাবে। বিদেশী কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষেত্রে কি ধরনের শর্ত দেওয়া যাবে না, তার তালিকাও সেখানে দেওয়া হয়েছে। এর মূল বিষয়গুলি এরকম ঃ

প্রথমতঃ, ভারতে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে হলে বিদেশী কোম্পানীকে তাদের উৎপাদনের নির্দিষ্ট অংশে বা অনুপাতে ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করতে হবে — এরকম কোন দেশীয় আইন বা নির্দেশ থাকলে তা প্রত্যাহার করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনরকম অনুপাত বা পরিমাণ বলা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী কোম্পানীগুলি তাদের উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে ইচ্ছামত পণ্য আমদানি করতে পারবে। তাদের আমদানি পণ্যের পরিমাণ বেঁধে দেওয়া যাবে না।

তৃতীয়তঃ, বিদেশী কোম্পানী পণ্য আমদানির জন্য যত খুশী বিদেশী মুদ্রা চাইতে পারে। ভারতে তারা যা উৎপাদন করছে, তার থেকে কতটা তারা বিদেশে রপ্তানি করছে এবং কি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ভারতে আনছে — এসব বিচার করা চলবে না। উৎপাদন থেকে মাল বিক্রি ও রপ্তানি — সবই বিদেশী কোম্পানীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও নীতির উপরই নির্ভর করবে ; সেখানে কোন হস্তক্ষেপ চলবে না। অর্থাৎ, বিদেশী পুঁজিকে দেশের বাজারে বিনিয়োগের অধিকার দেওয়ার পর, বিদেশী কোম্পানীর ব্যবসায় উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা চলবে না।

এভাবেই 'ট্রিমস্' আইনের দ্বারা দেশে দেশে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কোম্পানীগুলির অবাধ লুঠের অধিকার কায়েম করার রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, 'ট্রিমস্' চুক্তিতে বিদেশী পুঁজির অবাধ লগ্নীর অধিকার দেওয়া হয়নি। একথা ঠিক যে, ট্রিমস্ চুক্তিতে বলা হয়েছে, এটি কেবল পণ্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। (This agreement applies to investment measures related to trade in goods only, hereafter referred to as 'TRIMS') কিন্তু আবার Article-9-এ একথাও বলে দেওয়া আছে যে, পাঁচ বছর পর 'ট্রিমস্' চুক্তির পর্যালোচনা করা হবে এবং যদি মনে করা হয় যে, এর মধ্যে পুঁজি লগ্নী ও প্রতিযোগিতার নীতিও যুক্ত করা দরকার, তবে তা করা যাবে।

অবশ্য ভারতের শাসকশ্রেণীর নয়া আর্থিক ও শিল্পনীতি বিদেশী লগ্নী পুঁজির জন্য ভারতের অর্থনীতির নানা ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই খুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের শাসকশ্রেণী ও সরকার শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কাছে এদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের জন্য দরবার পর্যন্ত করছে। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও ব্রিটেনে গিয়ে বলেছেন, ভারতে বিদেশী শিল্প জাতীয়করণের কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং জাপানী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জানিয়ে দিয়েছেন, বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ভারতে অর্জিত মুনাফা নিয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভারত সরকার টাকাকে সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করার পথে বহুদূর এগিয়েছে ; ইতিমধ্যেই বিদেশী মুদ্রা আইন (FERA) কার্যতঃ তুলে দেওয়া হয়েছে ; বিদেশী ভোগ্যপণ্যের আমদানিও অবাধ করার কথা সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। সুতরাং, ভারত সরকারের ক্ষেত্রে ট্রিমস্ চুক্তিতে সই না দেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না।

বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের প্রশ্নে ভারতের মত অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণীর এই ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বাকি যে কাজটি করার দরকার ছিল, ট্রিমস্-এর মধ্য দিয়ে তা-ই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বিদেশী কোম্পানীর উপর উপরোক্ত বিধিনিষেধগুলি অপসারণ করার শর্ত থেকে ন্যূনতম উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। অন্যান্য বিষয়ে বাজার খোলার শর্তাবলী থেকে তাদের ছাড় দেওয়া হলেও ট্রিমস্-এর ক্ষেত্রে তাদের সাত বছর সময় দেওয়া হয়েছে। ভারতের মত দেশগুলিকে ট্রিমস্ সংক্রান্ত আইন চালু করতে হবে পাঁচ বছরের মধ্যে।

বলা বাহুল্য, বিদেশী লগ্নীপুঁজির দ্বারা ভারতীয় জনগণের শোষণ ও ভারতের প্রকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠনের বিষয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর কোন চিন্তা বা উদ্বেগ থাকার কথা নয় এবং তাদের তা নেই-ও। বরং, ভারতের মন্ত্রী ও পুঁজিপতিরা বিদেশে গিয়ে প্রধানতঃ এই প্রচারই করছেন যে, ভারতে অনেক কম পয়সায় দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর পাওয়া যায় ; ভারতে বিপুল সংখ্যায় অসংগঠিত শ্রমিক আছে, যাদের নামমাত্র মজুরিতে পশুর মত খাটিয়ে নেওয়া যাবে। পাশাপাশি ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীর যে সামান্য অংশটি সংগঠিত, তারাও যাতে দেশী বিদেশী কোম্পানীর নির্বিচার যৌথ শোষণের পথে এমনকি কানুনী আন্দোলনও গড়ে তুলতে না পারে, তার জন্য ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইনকেও বদল করে দেওয়া হবে বলে সরকার ঘোষণা করেছে।

ভারতে বিদেশী লগ্নীপুঁজির ও ভোগ্যপণ্যের অবাধ আমদানি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে দুটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে — একদিকে বিদেশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা এবং অন্যদিকে ভারতীয় একচেটে পুঁজিগোষ্ঠীগুলির নিজস্ব পুঁজির জোর ও আধিপত্য প্রসারিত করার প্রতিযোগিতা। এই দ্বিতীয় পথে ভারতের বৃহৎ কোম্পানীগুলি, বিদেশী কোম্পানীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষাকবচ গড়ে তুলতে চাইছে। এর ফলে, ভারতীয় অর্থনীতিতে কোম্পানী-কোম্পানী 'মার্জার' বা মিশ্রণের ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে — যার মধ্য দিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হয়েছে। ভারত সরকার প্রচার করছে যে, বিদেশী কোম্পানীগুলির অবাধ আগমনের ফলে ভারতের বাজারে যে প্রতিযোগিতা দেখা দেবে, তার দ্বারা ভারতের শিল্পায়ন হবে ও জনগণের সমস্যার লাঘব হবে। এই সরকারী প্রচার কতদূর সত্য, তা আমরা পরে বিচার করব।

ট্রিপস্ বা মেধা সম্পদের অধিকার

কৃষি সংক্রান্ত গ্যাট চুক্তির আলোচনায় ট্রিপস্-এর প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, গ্যাট-এর সঙ্গে মেধা সম্পদের অধিকারের শর্তাবলী যুক্ত করা হয়েছে বিশ্বে কাঁচামালের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উৎসগুলির উপরেও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আধিপত্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে।

আধুনিক শিল্পপণ্যের বাজারে জাপানের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে, জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অন্যতম প্রধান অভিযোগ হচ্ছে — মার্কিন প্রযুক্তি যথেচ্ছ অনুকরণ করেই জাপান প্রযুক্তিতে এগিয়েছে ; ফলে প্রযুক্তির অনুকরণ ঠেকাতে হবে। এ নিয়ে মার্কিন-জাপান দুই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরোধ বহুদূর এগিয়েছে, যার মীমাংসা এখনও হয়নি। কিন্তু মার্কিন শিল্পপণ্য ও প্রযুক্তির অনুকরণ রোধ করার নামে, গ্যাট-এর ট্রিপস্ চুক্তিতে যেসব শর্ত নিয়ে আসা হয়েছে, তার ফলাফল গোটা বিশ্বে কারিগরী বিজ্ঞানের গবেষণা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী। এর ফলে বিশ্বের প্রযুক্তিগত বিকাশের উপর সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজির একাধিপত্য কায়েম হবে ; যা ভারতের তথা সমগ্র অনুন্নত বিশ্বের দরিদ্র জনজীবনের খাদ্য ও চিকিৎসার সংকটকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে।

মেধা বা বুদ্ধিকে 'ব্যক্তি সম্পত্তি' হিসাবে চিহ্নিত করে গ্যাট-এ বলা হয়েছে যে, মানুষের মেধাজাত যে কোন বস্তুর উপর অধিকারও ব্যক্তিসম্পত্তির অধিকারের মধ্যে

পড়ে ; ফলে মেধাজাত বস্তুর মালিকানা নির্ধারণ করা ও মালিককে আইন করে মালিকানা স্বত্ব দেওয়া ব্যবসার স্বার্থে প্রয়োজন, যাতে ঐ মালিক তার সম্পত্তি এমন ব্যক্তিবর্গ বা ক্রেতাদের বিক্রি করতে বা লীজ দিতে পারে, যাদের তার দাম দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এই মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করার ও তাকে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করার নিয়মবিধি রচনা করে দেওয়া হয়েছে ট্রিপস্-এ, যা অনুসরণ করে প্রতিটি গ্যাটসদস্য দেশকে নিজ নিজ দেশের সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন বা পরিবর্তন করতে হবে। দেশী বিদেশী উভয় ক্ষেত্রেই মেধাসম্পদের এই মালিকানা স্বত্ব দিতে হবে। এই মালিকানা স্বত্ব দেওয়ার রূপ ও পদ্ধতিকেই কপিরাইট, ট্রেড মার্ক ও পেটেন্ট ইত্যাদি বিষয় দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এর মধ্যে পেটেন্ট-এর নিয়মাবলী হচ্ছে সর্বগ্রাসী। কারণ, প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রকে জড়িয়েই পেটেন্ট ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ট্রিপস্-এর পেটেন্ট সংক্রান্ত ধারায় বলা হয়েছে, "Patent shall be available for any inventions, whether product or process, in all fields of technology, provided they are new, involve an inventive step and capable of industrial application." অর্থাৎ, প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে যা কিছু আবিষ্কার, তা পণ্য বা পণ্য তৈরির প্রক্রিয়া যেটাই হোক, যদি নতুন হয় ও শিল্পে প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে, তবে তার পেটেন্ট পাওয়া যাবে। সুতরাং, পেটেন্ট ব্যবস্থাকে কার্যতঃ কোন সীমা দিয়ে আর বাধা যাবে না।

একটি বিশেষ বস্তু তৈরি করতে অপর যে বস্তু বা বস্তুকণার প্রয়োজন হয়, সেই বস্তুকণার স্বত্বাধিকার দেওয়া হচ্ছে প্রোডাক্ট পেটেন্ট। আর বিশেষ বস্তুকণা থেকে যে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বিশেষ বস্তু তৈরি হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়ার উপর স্বত্ব স্থাপন করা হচ্ছে প্রসেস পেটেন্ট। ভারতের প্রচলিত বর্তমান পেটেন্ট আইনে বস্তুকণার উপর পেটেন্ট দেওয়া হয় না ; এখানে কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ার উপর পেটেন্ট দেওয়ার আইন আছে। বিশেষ বস্তুকণার উপর পেটেন্ট না দিয়ে যদি কেবল বিশেষ প্রক্রিয়ার উপর পেটেন্ট দেওয়া হয়, তাহলে ঐ বিশেষ বস্তুকণার পেটেন্ট হোল্ডার কেবল ঐ প্রক্রিয়া অন্য কেউ অনুসরণ করলে, তাতে বাধা দিতে পারে ; কিন্তু যদি কেউ একই বস্তুকণা থেকে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় একই বস্তু তৈরি করে — যা বহুক্ষেত্রেই সম্ভব এবং দুনিয়ায় যা করা হয়েও থাকে, তবে পেটেন্ট হোল্ডার তাতে বাধা দিতে পারে না। এর ফলে ওষুধ বা অন্য কোন বস্তুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। কিন্তু নতুন গ্যাটের ট্রিপস্ ব্যবস্থায় স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গ্যাট সদস্য প্রতিটি দেশকে প্রোডাক্ট ও প্রসেস দুই রকম পেটেন্টই দিতে হবে।

ট্রিপস্-এ বলা হয়েছে, গ্যাট সদস্য প্রতিটি দেশকে পেটেন্ট ইসু করতে হবে। যে পণ্য বা প্রক্রিয়ার জন্য পেটেন্ট চাওয়া হবে, সেটি ভারতে না বাইরে আবিষ্কার করা হয়েছে, কিংবা ভারতে তৈরি করা হচ্ছে না বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে, তা বিচার করা চলবে না। এর অর্থ হচ্ছে, কোন পণ্য বা প্রক্রিয়া, তা বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই আবিষ্কৃত হয়ে থাক না কেন, কোন কোম্পানী যদি ভারতে তার পেটেন্ট দাবী করে তবে তা দিতে হবে। ভারতে পেটেন্টপ্রাপ্ত কোন পণ্য যদি ভারতে উৎপাদন না করে বিদেশে উৎপাদন করে আমদানি করা হয়, তবে সেটাও আইনসম্মত বলে ধরে নিতে হবে। কোন কোম্পানী পেটেন্টের মালিকানা স্বত্ব অন্য কাউকে assign করতে পারবে, মালিকানা পরম্পরায় তার হাতবদল ঘটাতে পারবে, তার লীজ কন্ট্রাক্ট দেওয়ার অধিকার থাকবে। এখানে সরকারী হস্তক্ষেপ চলবে না।

প্রোডাক্ট বা প্রসেস পেটেন্ট মালিকের চুক্তিবদ্ধ অনুমোদন ছাড়া অন্য কেউ ঐ বিশেষ প্রোডাক্ট বা প্রসেসকে নির্মাণ, ব্যবহার, বিক্রি বা আমদানি করতে পারবে না। একটি পেটেন্টের আয়ু হবে ২০ বছর। ভারতের প্রচলিত বর্তমান আইনে ৭ বছরের বেশি পেটেন্টের অধিকার দেওয়া হয় না।

পেটেন্ট শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে, এমন অভিযোগ প্রমাণের পদ্ধতিও নতুন গ্যাটে. পাল্টে দেওয়া হয়েছে। ট্রিপস্-এ বলা হয়েছে যে, কোন পেটেন্ট হোল্ডার যদি অভিযোগ করে যে, তার পেটেন্ট পাওয়া প্রক্রিয়া ব্যবহার করেই অপর কেউ একটি বিশেষ বস্তু তৈরি করেছে, তবে সেই অভিযোগকেই বিচারালয় সত্য বলে ধরে নেবে এবং সেক্ষেত্রে অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তার অনুসৃত প্রক্রিয়াটি ভিন্নরকম। একারণেই গ্যাট-৯৪-তে 'প্রমাণের দায়' এই অধ্যায়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, একই ধরনের পণ্যের (identical product) ক্ষেত্রে, কোন প্রমাণ না থাকলেও, সর্বদা ধরে নেওয়া হবে যে, ঐ পণ্য তৈরির প্রক্রিয়াও অভিন্ন (identical)। এই অবস্থায় প্রসেস পেটেন্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা হলে, তা যথার্থ বলে ধরে নিতে হবে। এর অর্থ, অভিযোগ অ-প্রমাণ করার দায় অভিযুক্তের উপর বর্তাবে ; অভিযোগকারীর উপর নয়। যেহেতু ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় অভিযোগ প্রমাণের দায় অভিযোগকারীর, অভিযুক্তের নয়, সেহেতু গ্যাট আইন অনুযায়ী ভারতীয় আইনের ঐ মূল ভিত্তিটি পাল্টাতে হবে।

ট্রিপস্ আইন অনুযায়ী গ্যাট সদস্য দেশগুলির নিজ নিজ পেটেন্ট আইন পরিবর্তন করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে — যার নাম দেওয়া হয়েছে অন্তবর্তী পর্যায়।

নতুন গ্যাট আইন চালু হওয়ায় ১ বছরের মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলিকে নিজ নিজ দেশের জন্য অনুরূপ আইন করতে হবে। ভারতের মত (উন্নয়নশীল) দেশগুলির জন্য ৫ বছর সময় দিয়ে বলা হয়েছে যে, এইসব দেশে প্রোডাক্ট পেটেন্ট ব্যবস্থা না থাকলে, তা চালু করার জন্য বাড়তি ৫ বছর সময় দেওয়া যাবে। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই ভারতে যেসব কোম্পানী পেটেন্টস্বত্বের জন্য আবেদন করবে, তাদের আবেদনকে গোপন রাখতে হবে এবং ১০ বছর পর পেটেন্টস্বত্ব দেওয়ার সময় ধরে নিতে হবে যে, তারা যে তারিখে আবেদন করেছিল, তাদের স্বত্ব সেই তারিখ থেকেই কার্যকরী। এর অর্থ হচ্ছে, যে পণ্য বা প্রক্রিয়ার পেটেন্ট-এর রেজিস্ট্রেশন চেয়ে ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারী কোন কোম্পানী ভারতে আবেদন জমা দেবে, সেই পণ্য বা প্রক্রিয়ার উপর আগামী ১০ বছরের মধ্যেও অন্য কোন ভারতীয় বা বিদেশী কোম্পানীকে পেটেন্ট দেওয়া চলবে না। এই বিধানটি বিশেষ করে ওষুধ ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত রাসায়নিক পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ প্রসঙ্গে বাড়তি আর একটি শর্তও আছে। ওষুধ ও রাসায়নিক কৃষিপণ্যের পেটেন্ট আবেদনের রেজিস্ট্রেশন ভারতে কোন কোম্পানীকে ১০ বছর পর দেওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু এই সময়ে যদি ঐ বিশেষ ওষুধ বা রাসায়নিক কৃষিপণ্য ভারতের বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা থাকে, তবে তা বাজার জাত করার একান্ত অধিকার (exclusive marketing right) পাঁচ বছরের জন্য বা যতদিন পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন দেওয়া না হচ্ছে, ততদিন ঐ বিশেষ কোম্পানীকেই দিতে হবে। সুতরাং, শুধু নতুন আবিষ্কৃত দ্রব্যের ক্ষেত্রেই নয়, প্রচলিত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও পেটেন্ট দিতে হবে।

পেটেন্টের ক্ষেত্রেও 'ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট'-এর শর্ত আছে। পেটেন্টের যেসব সুযোগ দেশীয় কোম্পানীকে দেওয়া হবে, বিদেশী কোম্পানীকেও তা দিতে হবে। কোন কোম্পানী যে পণ্য বা প্রক্রিয়ার পেটেন্ট কোন একটি গ্যাট সদস্য দেশে পাবে, অন্যান্য সদস্য দেশকেও তার পেটেন্ট দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের দেশের কোনও বিশেষ আইন বা সরকারি নির্দেশ দেখিয়ে বলা যাবে না যে, তার দেশে ঐসব বিষয়ে পেটেন্ট দেওয়া হয় না। একমাত্র দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত বিষয়ে পেটেন্ট না দেওয়ার কোন দেশীয় আইন থাকলে, গ্যাট-এর পেটেন্ট আইন সেখানে প্রযোজ্য হবে না।

কৃষিক্ষেত্রে ট্রিপস্-এর শর্তাবলী ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ট্রিপস্-এর উপরোক্ত শর্তগুলি থেকে একথা পরিষ্কার যে, আবিষ্কারককে তার মেধার মূল্য দেওয়া প্রয়োজন বলে নতুন গ্যাটে যে নৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে, তা শয়তানের ছলনা ছাড়া কিছু নয়।

ইতিহাস বলছে, জ্ঞান ও আবিষ্কারকে গোপন রাখার জন্য সমাজে পেটেন্ট ব্যবস্থার উদ্ভব হয়নি। বরং সমাজ যাতে তা জানতে পারে, তার জন্যই নতুন আবিষ্কারের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা অন্য সকল কিছুর মতই ক্রমে মানুষের জ্ঞান ও মেধাকেও পুঁজির দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধেছে। পুঁজিবাদে জ্ঞান ও মেধাও পণ্যে পরিণত হয়েছে; বেতন ও মজুরীর বিনিময়ে পুঁজিপতিরা বিজ্ঞানীর জ্ঞান, মেধা ও আবিষ্কারকে কিনে নিচ্ছে, তাকে পেটেন্টবন্দী করে মুনাফার স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। আসলে আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে আধুনিক পণ্য উৎপাদনের উপায় ও উপকরণগুলিরও দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটছে ; ফলে বিশ্ববাজার ভাগ দখলের তীব্র প্রতিযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি বিশ্বের কাঁচামালের শুধু আবিষ্কৃত বর্তমান উৎসগুলিই নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উৎসগুলির উপর দখল কায়েম করতে চাইছে এবং ট্রিপস বা পেটেন্ট ব্যবস্থা তারই হাতিয়ার। সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজির এই চরিত্র ১৯১৬ সালেই লেনিন উদঘাটিত করে দিয়েছিলেন। (Finance capital is interested not only in the already discovered sources of raw materials but also in potential sources, because present day technical development is extremely rapid. ঃ Lenin. Imp. the highest stage.. . . Vol 22 p. 261)। পুঁজিবাদীরা জনগণকে বোঝাচ্ছে যে, আবিষ্কারের উপর পেটেন্ট দাবী করা যেন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, এ যেন মানবসভ্যতার ধর্ম ! এটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বড় বড় বিজ্ঞানী, লুই পাস্তুর, মাদাম কুরী কিংবা আইনস্টাইনের মতো মহান বিজ্ঞানীরা কখনও তাদের আবিষ্কারকে পেটেন্ট করার কথা ভাবেননি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও আধুনিক গবেষণার শীর্ষে পৌছেছিল ; কিন্তু সেখানে কোন পেটেন্ট ব্যবস্থা ছিল না ; সমগ্র মানব জাতির জন্য সেই জ্ঞান ও আবিষ্কার উন্মুক্ত ছিল। বস্তুতঃ, আই এম এফ, বিশ্বব্যাংক ও গ্যাট — কোন একটি সংস্থারও সদস্যপদ না নিয়েই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। তার কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ট্রিপস্ চুক্তির ফলাফল ভারতের অর্থনীতিতে কি পড়বে, তা নিয়ে ভারতের বুর্যোজাশ্রেণী চিন্তিত নয়। কারণ, তার দায় বহন করতে হবে দেশের আপামর সাধারণ মানুষকে। এর আশু ফল রূপে ওষুধ ও কৃষি সংক্রান্ত নানা রাসায়নিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। শস্যবীজের পেটেন্ট ব্যবস্থা মিলিয়ে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয়

বিজ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষা মার খাবে, খাদ্য সংকট বৃদ্ধি পাবে, বিদেশী ঋণ বৃদ্ধি পাবে। খাদ্যের জন্যও ভারতীয় জনগণকে নির্ভর করতে হবে বিদেশী সহায়তার উপর — এমন সম্ভাবনাও অমূলক নয়।

আমেরিকা-ইউরোপে পেটেন্ট ব্যবস্থা চালু আছে, ওষুধের দাম সেখানেও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। স্বাস্থ্যবীমা না থাকলে ঐসব দেশের সাধারণ মানুষও চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে পারে না। ভারতে ESI নামে যা আছে, তার হাল সকলেই জানা। কিছুদিন আগেও ভারতের অর্থমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রী উভয়েই বলেছিলেন যে, ওষুধের দাম বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নেই ; তা যদি বাড়েও তবে সরকার ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল আইনের বলে তা নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকারী মিথ্যাচার এখন নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সরকার অতি সম্প্রতি অধিকাংশ ওষুধের ডি-লাইসেন্সিং করে নতুন ড্রাগ পলিসি ঘোষণা করেছে ; যার ফলে অধিকাংশ ওষুধের দামের ক্ষেত্রে কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণ আর থাকবে না। সরকারি নিয়ন্ত্রণ আইন থাকার সময়েই ওষুধের দাম যা বেড়েছে, তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। আইন উঠে যাওয়ার পর দাম কোথায় যাবে, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এটাই সরকারী উদারনীতি ও গ্যাট-এর ট্রিপস্-এর অনিবার্য পরিণাম।

ট্রিপস সম্পর্কে ভারত সরকারের বক্তব্য ও বাস্তব পরিস্থিতি

অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একদিকে পুঁজির স্বল্পতা ও অন্যদিকে পুঁজিপতিশ্রেণীর দ্রুত মুনাফালাভের উদগ্র লালসার ফলে যেখানে নিজস্ব প্রযুক্তি গবেষণা এমনিতেই সীমাবদ্ধ, সেখানে নতুন ট্রিপস্-এর শর্তাবলী তার ন্যূনতম সম্ভাবনাকেও গলা টিপে মারবে। ট্রিপস্ সম্পর্কে সরকারি অনেক প্রচারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে — বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে এদেশে বিদেশী প্রযুক্তিও আসবে ; পেটেন্ট ব্যবস্থার ফলে প্রযুক্তি গবেষণায় ভারতীয় শিল্পপতিদের উৎসাহ সৃষ্টি হবে, তারা পুঁজিও ঢালবে ; তাছাড়া প্রতিযোগিতার মুখে পড়লে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশ হবে। বিদেশী পুঁজি ভারতে ডেকে আনার সমর্থনেও একই কথা ভারত সরকার জনগণকে শুনিয়েছে। কিন্তু গত তিন বছরে প্রযুক্তি গবেষণায় সরকারী উদারনীতির ফলাফলের এক সমীক্ষা চালিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার রিপোর্টে দেখিয়েছে যে, উদারনীতি চালু হওয়ার পর গত তিন বছরে ভারতের বৃহৎ কোম্পানীগুলি প্রযুক্তি গবেষণায় ১

শতাংশও ব্যয় বাড়ায়নি। আর, বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে বিদেশী প্রযুক্তি পাওয়ার যে লোভে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা লালায়িত, তার গোড়ায় জল ঢেলে দিতেই গ্যাট-এর মধ্যে ট্রিপস্-কে ঢোকানো হয়েছে। বিদেশ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানির সরকারী নীতিতেও ক্রমাগত সংশোধন করা হচ্ছে। প্রথমে ভারত সরকারের আমদানি-রফতানি নীতিতে বিদেশ থেকে ৭ বছরের পুরানো যন্ত্রপাতি আমদানির অধিকার দেওয়া হয়েছিল ; সাম্প্রতিক সংশোধনীর পর তা ১৫ বছরের পুরানো যন্ত্রপাতি পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে। এই ঘটনা কি প্রমাণ করে যে, ভারতের শিল্পপতিরা নিজস্ব প্রযুক্তি গবেষণায় আগ্রহী ?

শুধু প্রযুক্তি নয়, একটু গভীরে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে যে, এমনকি ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী শিল্প উৎপাদনেও আজ আর পুঁজি বিনিয়োগে ততটা আগ্রহী নয়। ইতিপূর্বে ভারতের শাসকশ্রেণী জনগণকে বোঝাত যে, ভারতের শিল্পায়নে পশ্চাদ্‌পদতার কারণ পুঁজির স্বল্পতা। এই প্রচারে জনগণকে বিভ্রান্ত করে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাকেই আড়াল করার চেষ্টা হত। কিন্তু বর্তমানে সেই অজুহাতও অচল। কারণ, ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আজ কেবল ভারতের পুঁজির বাজারেই নয়, পুঁজির জোর বাড়াতে এমনকি বিদেশের শেয়ার বাজারে গিয়েও পুঁজি তুলছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঋণদাতা কোম্পানী থেকে ব্যাপকহারে স্বল্পমেয়াদী ঋণও তারা করছে।

পুঁজি যাচ্ছে কোথায়

১৯৯১-৯২ সালে ভারতীয় কোম্পানীগুলি বাজারে শেয়ার ইসু করে ও অন্যান্য ঋণের মধ্য দিয়ে ১৩,৪৫০ কোটি টাকা তুলেছিল। ১৯৯২-৯৩ সালে এই পরিমাণ ছিল ২৮,১৯৫ কোটি টাকা ; ১৯৯৩-৯৪ সালে তা ৩০,৯৩০ কোটি টাকা হবে। এছাড়াও '৯৩-'৯৪ সালে ইউরোপের শেয়ার ও ঋণের বাজার থেকে ভারতীয় কোম্পানীগুলি ৭,৮০০ কোটি টাকারও বেশি (প্রায় ২.৬ বিলিয়ন ডলার) তুলেছে। সংবাদে প্রকাশ, আগামী বছরে ভারতীয় কোম্পানীগুলি ইউরোপের শেয়ার/বন্ডের বাজার থেকে আরও ৯.৩ বিলিয়ন ডলারের মত পুঁজি তুলবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিপুল হারে দফায় দফায় পুঁজি যা তোলা হচ্ছে, তা কোথায় ও কিভাবে ব্যয়িত হচ্ছে ? সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন করা বা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো বা কোনরকম আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্যই বাড়তি পুঁজি তোলা হয়, যা বিনিয়োগ করে কোম্পানী ভবিষ্যতে মুনাফা বাড়িয়ে শেয়ারের ডিভিডেন্ট বা ঋণের সুদ ও আসল শোধ দিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে সেই উদ্দেশ্যে এত বিপুল

পুঁজি তোলা হচ্ছে কি ? এই বিষয়ে অতীতেও সরকারি নজরদারি ব্যবস্থা তেমন কিছু ছিল না, যার দ্বারা ঐ বাড়তি পুঁজি যথার্থই শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করা যায়। এই দায়িত্ব কন্ট্রোলার অফ ক্যাপিটাল ইসুস (CCI)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সরকারী উদারনীতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন CCI নামের সরকারি দপ্তরটিই তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই বাজার থেকে পুঁজি তুলতে সরকারি অনুমোদনের কোন প্রয়োজনই এখন আর পড়ে না এবং সেই পুঁজি কিভাবে ব্যয়িত হচ্ছে তা দেখারও কোন ব্যবস্থা নেই।

সুতরাং, পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় কোম্পানীগুলি দেশে-বিদেশের বাজার থেকে দেদার পুঁজি তুলছে, অথচ, শিল্পোৎপাদনে তা তেমন বিনিয়োগ হচ্ছে না ; যে হারে পুঁজি তোলা হচ্ছে, সেই হারে নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে না। বস্তুতঃ বর্তমানে শেয়ার বাজার থেকে কোম্পানীগুলি যে পরিমাণ পুঁজি তুলছে, তার অধিকাংশই আবার ফিরে যাচ্ছে শেয়ার বাজারের ফাটকা কারবারে ; না হয় রিয়েল এস্টেট (জমি বাড়ি তৈরি ও কেনা-বেচা) ব্যবসায়। এ কারণেই বড় বড় কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের ব্যালান্স শিটে দেখা যাচ্ছে, 'other income' বা 'অন্যান্য আয়' ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'অন্যান্য আয়' বলতে সেইসব আয়কেই বোঝানো হয়, যা কোম্পানীর তৈরি মাল বিক্রি করে হয় না। অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে হয় — যথা, শেয়ার বাজারের ফাটকা, সুদ আয়, বাড়িঘরের ব্যবসা ইত্যাদি। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (CMIE) প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ভারতের বৃহৎ কোম্পানীগুলি '৯২-'৯৩ সালে যা নীট মুনাফা করেছে, তার ৫২ শতাংশ হচ্ছে 'অন্যান্য আয়' থেকে। সংবাদে এও প্রকাশ যে, বিদেশ থেকে রাশি রাশি ডলার যা ভারতীয় কোম্পানীগুলি নিয়ে আসছে, তা আসলে অতীতে তাদেরই পাচার করা বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ডলার। ভারতের শেয়ার বাজারের লাভ দ্রুত ও বেশি বলে, তারা এখন সেই অর্থ এখানে ফিরিয়ে আনছে। যা পরিস্থিতি খারাপ মনে করলে, তারা আবার বিদেশে পাচার করে দেবে।

গ্যাটস্ – পরিষেবা বাণিজ্যের সাধারণ চুক্তি

শিল্প বিনিয়োগ ছেড়ে পুঁজির ক্রমাগত এই সুদখোর, ফাটকা পরগাছা চরিত্র কেবল ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই নয়, সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতিতেই শিল্প ও কৃষিকে ছাড়িয়ে পরিষেবা ক্ষেত্রের (service sector) ব্যাপক

প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে — শেয়ার বাজার, সুদের ব্যবসা ও রিয়েল এস্টেট (জমি বাড়ি তৈরি ও বেচা-কেনা) ব্যবসার রমরমা। তাই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির শেয়ার বাজারের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ও সংযোগ এখন আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির কাছে অপরিহার্য। নিউইয়র্ক থেকে টোকিও বা কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর অথবা লন্ডন থেকে বন কিংবা বোম্বাই শেয়ার বাজারের মধ্যে মিনিটে মিনিটে লগ্নী পুঁজির কেনা-বেচাই হচ্ছে এখন পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ। এজন্যই পরিষেবা বাণিজ্যেরও আন্তর্জাতিকীকরণ প্রয়োজন ; বিশেষ করে যোগাযোগ পরিষেবার এবং তার জন্যই দরকার লিবারালাইজেশন।

সুতরাং, নতুন গ্যাটে পরিষেবা বাণিজ্যকে যুক্ত করার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন্ ট্রেড ইন্ সার্ভিসেস (গ্যাটস্) বা পরিষেবা বাণিজ্য বলতে সেইসব পরিষেবা ক্ষেত্রকেই বোঝানো হয়েছে, যেগুলি নিয়ে বাণিজ্য হয়। এই ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে — ব্যাঙ্ক, বীমা, বিমান পরিবহন, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি। এর মধ্যে পুঁজির বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে বাণিজ্য, তার উপরই মূলতঃ জোর দেওয়া হয়েছে। গ্যাট-এর অন্যান্য চুক্তির মতই এইসব ক্ষেত্রেও বিদেশী কোম্পানীকে অবাধ প্রবেশ ও দেশীয় কোম্পানীর মত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। তবে পরিষেবা বাজার খোলার (market access) কতকগুলি সাধারণ বাধ্যতার (general obligations) দিক আছে, যা মানতেই হবে ; অপর কতকগুলি সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল — যেখানে গ্যাট সদস্য একটি রাষ্ট্র কতটা বাজার বিদেশী কোম্পানীর জন্য খুলবে না খুলবে, তা 'ন্যাশনাল কমিটমেন্টস্' হিসাবে গ্যাট-এ জমা দিতে হবে।

অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পের পর তৃতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে পরিষেবা। পরিষেবা ম্যানুফ্যাকচারিং নয়, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং-এর সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ড। যেমন, বিমানের যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং সেগুলি দিয়ে বিমান তৈরি করার যে কাজকর্ম সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং রূপে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে পড়ে ; কিন্তু বিমান চলাচলকে কেন্দ্র করে যে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম তা হচ্ছে পরিষেবা। এই অর্থেই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কমপিউটার সফ্টওয়ার ও সার্ভিস হচ্ছে পরিষেবা। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ভ্রমণকেও পরিষেবা ক্ষেত্র বলে গণ্য করা হয়। উৎপাদনে যে পুঁজি বা অর্থ (money capital) অপরিহার্য, সেই পুঁজির বাজার ও তাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ক্রিয়াকর্মও পড়ে পরিষেবা ক্ষেত্রে। বাড়ি-ঘর-ব্রীজ, রেলপথ ইত্যাদি

যা কিছু নির্মাণ-শিল্প, তাও অর্থনীতিতে পরিষেবা ক্ষেত্র। বিজ্ঞাপন, রেডিও, টিভি-সিনেমা-সংবাদপত্র ইত্যাদিও পরিষেবা।

নতুন গ্যাটে পরিষেবা ক্ষেত্রকে উদার করার জন্য তিনটি বিষয়কে মূলতঃ বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ পরিষেবা বা সার্ভিস দেওয়ার কাজের সঙ্গে যুক্ত এক দেশের নাগরিকদের অন্য দেশে প্রবেশাধিকার দিতে হবে। এই প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত বিদেশীদের প্রতি দেশীয় নাগরিকের মত আচরণ করতে হবে। কিন্তু এটা সকল সদস্য দেশকে একই হারে দিতে হবে, তা নয়। এ সম্পর্কে এক একটি দেশ তার প্রতিশ্রুতির তালিকা আলাদাভাবে গ্যাট-এ জমা দেবে। কিন্তু এই শর্ত চাকরি, নাগরিকত্ব কিংবা স্থায়ীভাবে বসবাস বা স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই ব্যাপারে প্রতিটি দেশের নিজস্ব যে আইন আছে, তা-ই বহাল থাকবে। এই বিধানটি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি দাবী করেছিল, শক্তিমান দেশগুলির বড় বড় কোম্পানী আধুনিক যন্ত্রপাতি রফতানি করতে পারবে ও সেই সুবাদে তা সার্ভিস করার জন্য লোকও যাবে। কিন্তু অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষমতা না থাকলেও, দক্ষ কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ার, কম্পিউটার প্রোগ্রামার আছে, যারা সার্ভিস সাপ্লায়ার হিসাবে বিদেশে চাকরি নিয়ে যেতে পারে। এদের আয় থেকে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি বিদেশী মুদ্রা পেতে পারে। সুতরাং, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ থেকে সার্ভিস রফতানি হিসাবে দক্ষ কারিগরদের বিদেশে যাওয়ার অবাধ অধিকার দেওয়া হোক। কিন্তু এই দাবী ডাংকেল ফর্মূলায় নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি দেশের মধ্যে টেলি-সংযোগের জন্য যে সরকারী ব্যবস্থা (public system) রয়েছে, তা ব্যবহারের সুযোগ বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানীদের দিতে হবে। এজন্য যে হারে চার্জ বা মূল্য দেশীয় কোম্পানীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, বিদেশী কোম্পানীদের ক্ষেত্রেও সেই একই হারে তা নিতে হবে। একইভাবে অর্থের বাজারে দেশীয় ও বিদেশী মুদ্রা লেন-দেনের, ব্যাঙ্ক লেন-দেনের যে সরকারি ব্যবস্থা (ক্লিয়ারিং) ইত্যাদি আছে, বিদেশী কোম্পানীদের তা ব্যবহার করা সুযোগ দিতে হবে। ঋণের ব্যবসা, শেয়ার বাজার বিদেশীদের জন্য খুলে দিতে হবে।

তৃতীয়তঃ, বিমান পরিবহনকে পরিষেবা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করার ফলে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। এক দেশের বিমান অন্য দেশে অবতরণ সংক্রান্ত অধিকারকে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির বিষয়রূপে গ্যাট-এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তদ্‌সত্ত্বেও, বিমান পরিষেবা সংক্রান্ত ব্যবসার কোন্ কোন্ ক্ষেত্র বিদেশী কোম্পানীর জন্য খুলে দিতে হবে, তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, গ্যাটসদস্য দেশগুলির মধ্যে বিমান চলাচল সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি আছে। তালিকায়

বলা হয়েছে — বিমান মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিমান চলাচল, কম্পিউটার রিজার্ভেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রের ব্যবসা বিদেশী কোম্পানীর জন্যও খুলে দিতে হবে।

একইভাবে অডিও ভিসুয়াল ক্ষেত্রকেও গ্যাট চুক্তির মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ — সিনেমা-টিভি-রেডিও-র ক্ষেত্রেও বিদেশী কোম্পানীর ব্যবসা করার অধিকার।

সুতরাং, গ্যাট-এর বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিষেবা চুক্তি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ভারতের ব্যাঙ্ক-বীমাসহ অর্থের বাজারের যাবতীয় কারবারে বিদেশী কোম্পানীর প্রবেশাধিকার দিতে হবে, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় ও বিমান পরিবহনে বিদেশী কোম্পানীর ব্যবসার অধিকার দিতে হবে; বিদেশী সিনেমার আমদানি অবাধ করতে হবে, বিদেশী টিভি ও রেডিও কোম্পানীকে ভারতে ব্যবসার সুযোগ দিতে হবে। তবে পরিষেবা সংক্রান্ত গ্যাট আইনে বলেই দেওয়া হয়েছে যে, কোন দেশ তার বাজারে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীদের কতটা প্রবেশাধিকার (market access) দেবে, সেটা সদস্য দেশের নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয় ; যা 'জাতীয় প্রতিশ্রুতি' (national committments)'র তালিকারূপে প্রতিটি দেশকে গ্যাট-এ জমা দিতে হবে। তাই বিদেশী কোম্পানীর জন্য বাজার খোলার কোন পরিমাণগত মানদন্ড বলে দেওয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, এক্ষেত্রেও প্রতিটি দেশ 'সর্বাপেক্ষা সুবিধাপ্রাপক দেশে'র শর্ত অনুযায়ী বাজার খুলবে। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীদের জন্য বাজার যতটাই হোক, খুলে দেওয়ার পর, তার ব্যবসার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ খাটানো চলবে না ; তাদের দেশীয় কোম্পানীর মর্যাদা দিতে হবে। এটাই হচ্ছে সাধারণ বাধ্যতা।

নতুন গ্যাটের মধ্যে পরিষেবা বাণিজ্যকে যুক্ত করার জন্য প্রধানতঃ আমেরিকাই চাপ দিয়েছে। ভারতের শাসকশ্রেণী তাতে কোন বাধা দেয়নি। কারণ, পরিষেবা বলতে গ্যাট-এ যেসব বাণিজ্য ক্ষেত্রকে অবাধ করার জন্য বলা হয়েছে — তা সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির বিশ্বজোড়া অবাধ চলাচলের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। সুতরাং, ভারতের পুঁজিবাদী বাজারকে আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির কারবারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার জন্য এবং ভারতের অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের জন্য তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শিল্প ও কৃষির মতই পরিষেবা ক্ষেত্রকেও বিদেশী পুঁজির জন্য উদার না করে পারে না।

বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের সংকট থেকে আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের সকল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিই নিজ নিজ লগ্নী পুঁজির বিশ্বে অবাধ চলাচল চাইছে। তার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের পুঁজির বাজারকে (capital market) কেন্দ্র করে যে কর্মকান্ড বা

financial services, তার ব্যবসা অবাধ করা তাদের কাছে অত্যন্ত জরুরী। এ প্রশ্নে আমেরিকার স্বার্থ বেশী, তার কারণ, প্রযুক্তি ও বিশ্বব্যাপী পুঁজি বিনিয়োগে জাপান ও ইউরোপের থেকে এখনও আমেরিকা এগিয়ে রয়েছে। শেয়ার/সুদের কারবারেও মার্কিন পুঁজি শীর্ষে। শিল্পপণ্যের রফতানি বাণিজ্যে আমেরিকা সাধারণভাবেই ঘাটতিতে পড়েছে, যা পূরণ করার জন্য কৃষিপণ্যের রফতানি বাড়াতে যেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে, ট্রিপস্-এর মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিগত আধিপত্য কায়েম রাখতে সচেষ্ট হয়েছে ; তেমনি পরিষেবা বাণিজ্যকেও আমেরিকা দেশে দেশে আরও উন্মুক্ত করতে চাইছে, যাতে এক্ষেত্রে মার্কিন আয় আরও বৃদ্ধি করা যায়। পরিষেবা বাণিজ্যেই আমেরিকা এখনও উদ্বৃত্ত ভোগ করে। বিশ্বে পরিষেবা রফতানি বাণিজ্যের সিংহভাগ আমেরিকার। মার্কিন দেশে চাকরির ৭০ শতাংশ রয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রে।

মার্কিন অর্থনীতিতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর চেয়ে পরিষেবা ক্ষেত্রের বেশি প্রসার, আশির দশকের মধ্যভাগে পুঁজিবাদী দুনিয়ার গুরুতর আলোচ্য বিষয় হয়েছিল — যার পথ ধরে আমরা সমগ্র বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তীব্র সংকটের চেহারা ও চরিত্রের কিছু পরিচয় পেতে পারি।

মন্দার প্রকোপে বাজারের অভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও বহির্বাণিজ্য যখন কমছে, শিল্প কলকারখানা যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন পরিষেবা ক্ষেত্রের কাজ বাড়ছে, পরিষেবা বাণিজ্যও বাড়ছে — যা আপাত অর্থে আশ্চর্যজনক। মার্কিন অর্থনীত্রি এই অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়েই পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা 'post industrial society' কথাটা চালু করেন ; যার দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে, পুঁজিবাদী সমাজ এখন শিল্প-উৎপাদনের স্তর পার হয়ে অন্য একটা স্তরে প্রবেশ করছে, যেখানে শিল্প-উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং আর অর্থনীতির মূল ক্ষেত্র থাকছে না। একটা 'নতুন আবিষ্কার' ভেবে তা নিয়ে বিস্তর হৈ চৈ ঐসময় হয়েছে। কিন্তু ক্রমেই 'post industrial' কথাটা অকেজো হয়ে গিয়ে তার জায়গায় 'de-industrial' কথাটা চালু হয়েছে, যার অর্থ — পুঁজিবাদ আর শিল্প গড়ছে না, শিল্প ভাঙ্গছে — বি-শিল্পায়ন ঘটাচ্ছে। ('. . . Economists pondering the wreckage are musing about high rates of parmanent 'structural' unemployment that could plague the industrialised or perhaps *de-industrialising* — nations for decades to come." — TIME, 7.2.94 - Job Panic)

তাহলে পুঁজি যাচ্ছে কোথায় ? আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দুই ক্ষেত্রেই পুঁজি বেশি বেশি সুদ ও ফাটকার কারবারে খাটছে। তাই মার্কিন পুঁজিবাদকে এখন ওদেশেই অনেকে বলছে 'ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজম্' ; অর্থাৎ, পুঁজি এখন সেখানে ক্যাসিনোতে

— জুয়ায় বিনিয়োগ হচ্ছে। এখানে জুয়া বলতে প্রধানতঃ শেয়ার/বন্ড কেনা বেচার কারবার, সুদ ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকেই বোঝানো হচ্ছে। ("...the centre of profit-taking has shifted markedly from industrial capital to the financial markets, it is in the latter that high incomes & rapid fortunes can be made." — Climax of Capitalism. p-228)

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুটি বৈশিষ্ট্য এখন প্রকট। প্রথমতঃ, আমেরিকা, জাপানসহ ইউরোপের শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির লগ্নী পুঁজি বেশি বেশি করে বিদেশে ছুটছে। ফলে গত দুই দশকে বিশ্বে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের একটা ভাল অংশ শেয়ারের ফাটকা, রিয়েল এস্টেট, ব্যাঙ্ক-বীমা ও ব্যবসায়িক ঋণের নানা খাতে খাটছে। এর ফলে বিশ্ব জোড়া পুঁজিবাদী শিল্প উৎপাদন ও বিশ্বের পণ্য বাণিজ্যে আপেক্ষিক অবনমন সত্ত্বেও শেয়ার বাজারগুলি টগ্‌বগ্‌ করছে ; পুঁজি শুধু পুঁজির ব্যবসা করেই বিপুল হারে স্ফীত হচ্ছে। এই যে পুঁজি আজ একই সঙ্গে বিশ্বের প্রধান প্রধান শেয়ার বাজারের ওঠানামার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশের শেয়ার বাজারে যাচ্ছে — তাকেই বলা হচ্ছে 'পুঁজির বিশ্বায়ন' বা 'গ্লোবালাইজেশন অফ্‌ ক্যাপিটাল'। তার ফলে, পুঁজিবাদী অর্থের বাজারের কার্যকলাপ, শেয়ার বাজারের চরিত্র ও কারবার, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণের ব্যবসা ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল রূপ নিয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও শেয়ার বাজারের তাৎক্ষণিক যোগাযোগের প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে ; ফলে, ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস, টেলি কমিউনিকেশন সার্ভিস, ব্যাঙ্কিং সার্ভিস, ইনসিওরেন্স সার্ভিস এখন বিশ্বজোড়া ব্যাপক কারবারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে, বিমান পরিবহনের ব্যবসা, টেলি যোগাযোগ যন্ত্রের ব্যবসার বাজার বেড়েছে। বিমান তৈরিতে এখনও মার্কিন কোম্পানীগুলির আধিপত্য রয়েছে। বিশেষ করে কম্পিউটার রিজার্ভেশন ব্যবস্থা বসানোর ব্যবসায় মার্কিন কোম্পানীই শীর্ষে। তাই পরিষেবা ক্ষেত্রে বাণিজ্য চুক্তিতে বিমান পরিবহন ও আন্তর্জাতিক রিজার্ভেশন ব্যবস্থাকে উদার করা হয়েছে।

লগ্নী পুঁজির আন্তর্জাতিক কারবারকে কেন্দ্র করেই ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। ঋণ ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের কারবারে নিয়োজিত বিদেশী লগ্নী কোম্পানীগুলি যে দেশে ঢুকেছে, সেই দেশের বাজার থেকেও তারা পুঁজি তুলছে। ফলে ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসাও তাদের কাছে খোলা থাকা চাই। (Transcending its traditional role, global banking became the centre of a self

generating financial boom—spreding its ever wider circles during the 1970's & 1980s. Not surprisingly, this ballooning of international banking was tied in with a host of new methods of financial speculation and manipulation." — Globalisation To What End : Harry Magdoff, 1992)

তাই গ্যাটেও দেশে দেশে ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় বিদেশী কোম্পানীদের প্রবেশাধিকারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন, অর্থের বাজারকে উদার করা সম্পর্কে ভারতের শাসকশ্রেণী কিছুটা ধীরে চলার নীতি নিয়েছে। ভারতে ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসা প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়। এখন তার বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে ঠিকই, তবে মালিকানায় বিদেশী শেয়ারের 'সিলিং' বেঁধে দিয়ে যৌথ উদ্যোগের নীতি নেওয়া হয়েছে। কারণ, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি গোষ্ঠীগুলি বিদেশের বাজার পাওয়ার জন্য বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে যখন গাঁটছড়া বাঁধছে ; বিদেশী কোম্পানীগুলি সেই সুযোগে বিশেষ বিশেষ লাভজনক ভারতীয় কোম্পানীতে বিদেশী শেয়ার মালিকানা বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী, যাদের পুঁজির ভান্ডার বিশাল, তারা সরাসরি ভারতীয় কোম্পানী কিনে নিতেও পিছপা হচ্ছে না। এখানেই ভারতের একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলি কিছুটা শঙ্কায় ভুগছে। তাই ভারতের ব্যাঙ্ক, বীমা ও শেয়ার বাজারের উপর তার নিজেদের কব্‌জা বেশি মাত্রায় রাখতে চাইছে যাতে দেশীয় বাজারে পুঁজির তোলার অধিকার নিজেদের হাতে রেখে পুঁজির জোরে তারা বিদেশী পুঁজির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। একটি 'উন্নয়নশীল' দেশ হিসাবে ভারতকে এই অধিকার গ্যাটে দেওয়া আছে ঠিকই, কিন্তু তা ধীরে ধীরে তুলে দিতে হবে। (". . restrictions on the kind of legal entity or joint venture through which a service is provided or any foreign capital limitations relating to minimum levels of foreign participation are to be progressively eleminated." — Summary of GATT Agreements, World Trade Centre, Bombay) অর্থাৎ, ব্যাংক-বীমা প্রভৃতি পরিষেবা ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ অথবা বিদেশী পুঁজির পরিমাণের উপর সিলিং ইত্যাদি উত্তরোত্তর বিলোপ করতে হবে। তাই লক্ষণীয় যে, ভারতের নানা একচেটিয়া গোষ্ঠী অতি দ্রুত নিজ নিজ কোম্পানীতে নিজস্ব শেয়ার হোল্ডিং বাড়াবার জন্য ময়দানে নেমেছে। অন্যদিকে নিজস্ব ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী খোলার জন্য তৎপর হয়েছে।

অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্র

এখন, পরিষেবা ক্ষেত্র বলতে গ্যাটে সকল প্রকার পরিষেবা সরবরাহ বোঝানো হয়েছে— 'for the purpose of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service'— সেটা এক দেশ থেকে অন্য দেশে, দেশের মধ্যেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে হতে পারে। পরিষেবা বলতে বোঝানো হবে, সরকারীভাবে সরবরাহ করা পরিষেবা ব্যতীত যে কোন ক্ষেত্রের যাবতীয় পরিষেবা। ("Service" includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority)। সরকারী পরিষেবা বলতে একমাত্র সেইসব পরিষেবাকেই ধরা হবে, যা সরকার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অথবা অন্য পরিষেবা কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সরবরাহ করে না। এই ধরনের পরিষেবা ব্যতীত অন্য সকল পরিষেবার বাণিজ্যে বিদেশী কোম্পানীকে দেশীয় কোম্পানীর মতই সমান অধিকারের ভিত্তিতে ব্যবসা করতে দিতে হবে।

এর অর্থ হচ্ছে, ভারতের বিদ্যুৎ, পরিবহন, ডাক যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, বাঁধ, ব্রীজ নির্মাণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রই বিদেশী পুঁজির জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ভারতের শাসকশ্রেণীও এই সব ক্ষেত্র বিদেশী পুঁজির জন্য খুলে দিতেই অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ও তৎপর। স্বাধীনতার পর ভারতের পরিকাঠামো সম্পর্কিত পরিষেবা ক্ষেত্র প্রধানতঃ জনসাধারণের টাকায় সরকারী মালিকানায় গড়ে তোলা হয়েছিল। কারণ, ভারতের একচেটে পুঁজিগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে কম মুনাফার পরিষেবা ব্যবসায় বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করতে আদৌ আগ্রহ দেখায়নি। তাছাড়া, উল্লিখিত পরিষেবাগুলির সঙ্গে সাধারণ দেশবাসীর ন্যূনতম কতকগুলি আবশ্যিক সার্ভিস পাওয়ার অধিকার জড়িত হয়ে আছে — যা বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশের শাসকশ্রেণী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। সেজন্যই জনপরিষেবার ক্ষেত্রগুলিকে 'মুনাফা'র স্বার্থে পরিচালনা না করে, প্রয়োজনে সরকারী ভরতুকি দিয়েও, যাতে তা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল পুঁজিবাদী সরকারগুলিকে। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জনকল্যাণকামী চরিত্র ও ভূমিকার ফলে দেশ্ দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের মধ্যে যে দুর্নিবার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল, তার চাপেই বিশ্বের পুঁজিবাদী শাসকরা 'কল্যাণকামী রাষ্ট্রে'র রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে

প্রতিবিপ্লবের ফলে উল্লসিত পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী তার পূর্বেকার 'কল্যাণকামী' মুখোশ খুলে ফেলছে ; জনপরিষেবার সকল ক্ষেত্রকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারী মালিকানার সর্বোচ্চ মুনাফার জালে। উত্তর গোলার্ধের উন্নত থেকে শুরু করে দক্ষিণের অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি পর্যন্ত সর্বত্র শাসকশ্রেণীর একই ভূমিকা।

ভারতে, গ্যাটের আগেই পরিষেবা ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছে। ভারতের রেল সার্ভিসে বেসরকারীকরণ শুরু হয়েছে, চিঠিপত্রে ব্যাপকহারে 'কুরিয়ার সার্ভিস' চালু করা হয়েছে, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বেসরকারীকরণের নীতি ঘোষিত হয়েছে, বিদ্যুতেও বেসরকারী মালিকানা আহ্বান করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ভারত সরকার বিদেশী কোম্পানীদের ন্যূনতম ১৬ শতাংশ মুনাফা দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েছে।

পরিষেবা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ ও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ সম্পর্কে ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, এর ফলে পরিষেবা ব্যবসায় প্রতিযোগিতা হবে, তার মান উন্নত হবে, জনগণই উপকৃত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ উন্নত পরিষেবা পেতে হলে, যা দাম দিতে হবে, তা দেওয়ার ক্ষমতা ভারতের কত শতাংশ মানুষের আছে ?

বেসরকারী ও বিদেশী কোম্পানীগুলি যদি বিদ্যুৎ ব্যবসায় ১৬ শতাংশ নিশ্চিত মুনাফা নেয়, তবে তার জন্য শহরের নিশ্চিত ক্ষেত্রকেই তারা বেছে নেবে। কোন গ্রাম বা শহরাঞ্চলের অনিশ্চিত ক্ষেত্রে সেই বিদ্যুৎ পৌছুবে কি ? আদৌ নয়। তাহলে পরিষেবা 'উন্নত' হবে ঠিকই, কিন্তু তা মুষ্টিমেয় ধনীদের জন্য। সাধারণ মানুষের জন্য সরকারী হাসপাতাল বা কর্পোরেশন স্কুলের মত কিছু ব্যবস্থা হয়ত কিছুকাল থাকবে, যা দরিদ্র মানুষদের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা ছাড়া আর কিছুই যোগাবে না।

দ্বিতীয়তঃ, ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, সরকারী কোষাগারে টাকার অভাব, তাই পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দায়িত্ব যদি বেসরকারী ও বিদেশী পুঁজি নেয়, তবে সরকারী অর্থের স্বল্প ভান্ডার দিয়ে জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় বাড়ানো যাবে ! সরকার এমন কথাও বলছে যে, ভরতুকির টাকা তো জনসাধারণেরই ; তা যদি 'অলাভজনক' খাতে ব্যয় করা হয়, তবে ক্ষতি জনগণেরই। এইসব মিথ্যা ও শঠতাপূর্ণ বক্তব্য জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই প্রচার করা হচ্ছে। কারণ, গত কয়েক বছরের বাজেটে দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হয়নি ;

কিন্তু 'কোম্পানী ট্যাক্স' 'ওয়েলথ্ ট্যাক্স' 'ক্যাপিটাল গেইন্স্ ট্যাক্স' — যা দেশের ধনী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের দিতে হয়, ক্রমান্বয়ে তা হ্রাস করা হচ্ছে। এমনকি গত দুই বছরের বাজেটে বিপুল হারে অন্তঃশুল্ক যা কমানো হয়েছে, তার জন্য বাজারদর এক শতাংশ হ্রাস পায়নি ; সব ছাড় মালিকরা আত্মসাৎ করেছে। নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি, হাজার হাজার কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে মালিক ও ধনী সম্প্রদায়। ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে, যা পূরণ করতে টাকা দেওয়া হচ্ছে বাজেট থেকে। এভাবে উত্তরোত্তর মালিকশ্রেণীকে যাবতীয় আর্থিক দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ফলে বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে। আবার, সেই ঘাটতির অজুহাত দিয়েই শিক্ষা, গবেষণা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল 'সমাজকল্যাণমূলক' খাতে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রেও সরকারী বিনিয়োগ কমছে। সুতরাং, কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে কোন্ শ্রেণীর উপর সরকারী নীতি আক্রমণ হানছে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার।

বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন (World Trade Organisation)

১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস্ সম্মেলনে আমেরিকা যখন বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা তুলেছিল, তখন আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের মত বাণিজ্যেও একটি স্থায়ী বিশ্ব সংস্থা তৈরি করার জন্য অন্যরা প্রস্তাব দিয়েছিল, যা মুক্ত বাণিজ্যের নিয়মাবলীর দেখভাল করবে। কিন্তু আমেরিকা তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল যে, বাণিজ্য নিয়মাবলী নিয়ে কোন স্থায়ী সংস্থার মধ্যে ঢুকলে আমেরিকার বাণিজ্য স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে। অর্থাৎ, কোনরকমের নির্দিষ্ট আচরণবিধির মধ্যে আমেরিকা যেতে চায়নি। তার ফলেই গ্যাট একটি সাময়িক বোঝাপড়ার ব্যবস্থা হিসাবে তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু উরুগুয়ে বৈঠকে এবার একটি স্থায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল এবং ডাংকেল খসড়ার পথ বেয়ে তা গ্যাট ৯৪-এর সিদ্ধান্ত রূপেও গ্রহণ করা হয়েছে। গ্যাট সদস্য দেশগুলির মধ্য থেকে সদস্য নির্বাচন করে ঐ সংস্থাটি ১৯৯৪ সালের মধ্যে গঠন করার কথা, যাতে ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে তা চালু হতে পারে। এ জন্যই, নতুন গ্যাট আইনগুলি কার্যকর করার তারিখ ধরা হয়েছে '৯৫ সালের ১লা জানুয়ারী। এই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাটি গঠিত হওয়ার পর পূর্বেকার গ্যাট বিলুপ্ত হবে ; নতুন নিয়মাবলী নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের যেসব আইন মারাকাশে চূড়ান্ত হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই বিশ্ব বাণিজ্যের নীতিনির্দ্ধারক সংস্থারূপে কাজ করবে। এই সংস্থার কর্মপদ্ধতির নির্দেশিকাও গ্যাট ৯৪-এ দেওয়া হয়েছে।

এজন্য প্রথমতঃ বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি করে ট্রেড কাউন্সিল গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেমন, ট্রেড কাউন্সিল অন সার্ভিসেস্, ট্রেড কাউন্সিল অন ট্রিমস্ বা ট্রেড কাউন্সিল অন ট্রিপস্ ইত্যাদি। সদস্য দেশগুলির মধ্যে যারা চাইবে, তারা এই কাউন্সিলগুলির সদস্য হতে পারবে। সদস্যরাই ভোট দিয়ে WTO'র চেয়ারম্যান নির্বাচন করবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশে দেশে বাণিজ্য বিরোধ দেখা দিলে, তার মীমাংসা পদ্ধতিকেও এবারে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এজন্য 'Dispute settlement mechanism' নামে পৃথকভাবে বিরোধ মীমাংসার নিয়মাবলীও তৈরি করা হয়েছে।

গ্যাট-এ সই দেওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যাপক জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়ে ভারত ও অন্যান্য অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির শাসকশ্রেণী বলছে যে, গ্যাট-কে যাতে শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশগুলি ব্যবহার করতে না পারে, গ্যাট-এর সুযোগ যাতে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি নিতে পারে, তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, স্থায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হওয়ার ফলে, তাকে ব্যবহার করে ভারত সরকার বিশ্ব বাণিজ্যে আমেরিকার চাপ ঠেকাতে পারবে।

কিন্তু WTO নামে যে বাণিজ্য সংস্থাটি গ্যাট-এর স্থান নেবে, তার কাজ হবে গ্যাট ৯৪-এর সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা ও তার লংঘন ঘটলে, তার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়া। বাণিজ্যের এক একটি ক্ষেত্রে অভিযোগের চরিত্র কি হবে, কিভাবে তা তোলা যাবে, বিচারপদ্ধতি কি হবে, মীমাংসা না হলে একতরফা বাণিজ্য-প্রতিশোধ নেওয়া যাবে, ইত্যাদি সবই গ্যাট আইনে বলে দেওয়া আছে। যেমন, পেটেন্টের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণের দায় অভিযুক্তের উপর বর্তাবে, এবং বাণিজ্যের এক ক্ষেত্রে অভিযোগের বদলা (cross retaliation) অপর বাণিজ্য ক্ষেত্রে নেওয়া যাবে — এগুলি গ্যাট-এর নানা বাণিজ্য চুক্তিতেই বলা আছে। অর্থাৎ, শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির হাতে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার গ্যাট-এই তুলে দেওয়া হয়েছে। তারপর আর নতুনভাবে WTO কি করবে ? তবে, বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে যে, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের বিষয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত যা নেওয়া হবে, তা ঐকমত্যের (consensus) ভিত্তিতে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা না হয়। শুধু এই ধরনের আইনের বলে যদি মার্কিন ও অন্যান্য শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির চাপ ঠেকানো সম্ভব হত, তবে রাষ্ট্রসংঘ কখনই আমেরিকার রবার স্ট্যাম্পে পরিণত হত না। তাছাড়া গ্যাটের

বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বর্তমান সংশোধন ও পরিধির বিস্তারের পরেও আমেরিকার ৩০১ ধারা থাকছেই। বিশ্বের নানা আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটগুলিও বহাল থাকছে।

বর্তমান সংকট ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

কিন্তু পাশাপাশি এও লক্ষণীয় যে, WTO'র দ্বারা শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কও অনেকটা নির্ধারিত হবে। এই অর্থে, বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুনভাবে একটি 'নিয়মশৃঙ্খলা'র কাঠামো দাঁড় করাবার জন্য WTO'র মধ্য দিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে, তা বলা যায়। বস্তুতঃ শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতিতে 'ভারসাম্য' রক্ষার সমস্যা এখন এতই প্রকট যে, শুধু পুঁজি রফতানি বৃদ্ধি দ্বারাই আভ্যন্তরীণ সমস্যার সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ; পুঁজিবাদের স্বার্থে মন্দা ও বেকার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার সরকারী পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ফলে, বিশ্বের ৭টি ধনীশ্রেষ্ঠ (জি-৭) দেশের শাসকরা পুঁজিবাদী সংকট সামাল দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে কতকগুলি নিয়মকানুন চালু করতে চাইছে। তাদের অর্থনীতিতে দুটি সংকট এখন গুরুতর রূপ নিয়েছে — ১) পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সঙ্গে তার পূর্বেকার উপায়-পদ্ধতির অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে। ২) মন্দা দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে পুঁজি দেশে ও বিদেশে দ্রুত ও উচ্চতর হারে মুনাফার জন্য উত্তরোত্তর সুদ ও ফাটকার কারবারে চলে যাচ্ছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একচেটিয়া পুঁজির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (State monopoly regulation) কোন বিশেষ একটি একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার উদ্দেশ্যে কাজ করে না। সাধারণভাবে সমগ্র অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের দ্বারা পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। যার মূল কথা হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চক্রাকার সংকটকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা। জাতীয় পুঁজি যখন দেশের গন্ডী ছাড়িয়ে বিদেশে বিনিয়োগে গেছে, তখন নিজ রাষ্ট্রের লগ্নী পুঁজির বৈদেশিক স্বার্থ রক্ষা করা ও জাতীয় পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করা — একই সঙ্গে এই দুটি উদ্দেশ্যই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার দ্বারা পূরণ করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয়নি। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিশ্ব লুঠ করা সম্পদ আবার নিজ নিজ রাষ্ট্রেই বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু তীব্র মন্দার প্রকোপে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিশাল বিশাল ট্রানস্ ন্যাশানাল ও মাল্‌টি ন্যাশানাল কোম্পানীগুলি যখন, পুঁজির সঙ্গে সঙ্গে সস্তা মজুরির

জন্য উৎপাদন প্ল্যান্ট পর্যন্ত অন্য দেশে নিয়ে যেতে শুরু করল, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের নামে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির থেকে লগ্নী পুঁজি যখন দেদার বাইরের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে যেতে থাকল, তার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতেও বেকার সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, তখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার প্রচলিত উপায়পদ্ধতির বিরোধ দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এতদিন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার যেসব উপায়পদ্ধতির সাহায্যে তার বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ — একই সঙ্গে এই দুটি উদ্দেশ্য সাধন করেছে, বর্তমানে সেইসব উপায়পদ্ধতিগুলি জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থরক্ষায় আর আগের মত কাজ করছে না। ফলে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষেও তাদের দীর্ঘায়িত মন্দার প্রকোপকে প্রশমিত করে 'ভারসাম্য' রক্ষা করা, বেকারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিশাল বিশাল একচেটিয়া ট্রানস্ন্যাশানাল ও মালটি ন্যাশানাল কোম্পানীগুলি এখন তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের সামগ্রিক পুঁজিবাদী পরিকল্পনার বাইরে চলে গেছে অথবা রাষ্ট্রউর্ধ্ব কোন শক্তি (Supra state power) অর্জন করেছে। বাস্তব ঘটনাও তা বলছে না। আজও আমেরিকা-ইউরোপ ও জাপানের রফতানিতে ঐসব রাষ্ট্রের TNC ও MNCগুলিরই প্রাধান্য রয়েছে ; জাপানের বাজারে মার্কিন পণ্য ঢুকতে মার্কিন প্রশাসন যে চাপ দিচ্ছে, তা মার্কিন TNC ও MNCগুলির জন্যই। এইসব কোম্পানীগুলির জন্য শিল্পপ্রযুক্তির গবেষণার মূল ব্যয়ভার বহন করছে রাষ্ট্রই। বৈদেশিক বাজার গবেষণাও সরকারী দপ্তরই করে দিচ্ছে। সুতরাং TNC ও MNCগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘুচে গেছে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বরং রাষ্ট্রই এদের মুখপাত্র। আসলে, এই সম্পর্কের একটা নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সঙ্গে তার পূর্বেকার উপায়-পদ্ধতির যে বিরোধ ঘটছে, তার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য নতুন উপায়পদ্ধতির সন্ধান চলছে।

এই উদ্দেশ্য থেকেই শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি মনে করছে যে, তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা এমন আন্তর্জাতিক নিয়মবিধি গড়ে তুলতে পারবে, যা সকল শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই স্বীকার করে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। কিন্তু তা যদি সাম্রাজ্যবাদ পারত, তবে তা আর সাম্রাজ্যবাদ থাকত না। সাম্রাজ্যবাদী বোঝাপড়ার রূপ যাই হোক না কেন, তার দ্বারা বিশ্ববাজার লুঠের তার মূল শ্রেণী উদ্দেশ্য পাল্টে

যায় না। প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই নিজ নিজ বৈদেশিক বাজার বৃদ্ধির মূল শ্রেণী লক্ষ্য থেকে পরিচালিত হয় বলে, যেকোনরকম সাম্রাজ্যবাদী সমঝোতাই বিশ্বকে নতুনভাবে ভাগ করে নিয়ে লুঠ করার সমঝোতা এবং তা সাময়িক হতে বাধ্য। অন্যথায়, গ্যাট চূড়ান্ত হওয়ার পরেও মার্কিন-জাপান, মার্কিন-কানাডা, মার্কিন-ইউরোপ বিরোধ তীব্র হচ্ছে কেন? এই ঘটনাও প্রমাণ করে যে, একচেটিয়া লগ্নীপুঁজির জাতীয় ভিত্তি ও রাষ্ট্রসত্তা পুরোপুরি বর্তমান।

ভারতের ভূমিকার মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াস্বার্থেরই প্রতিফলন ঘটছে

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার উপরোক্ত অন্তর্বিরোধ ভারতের ক্ষেত্রেও ভিন্ন দিক থেকে দেখা দিয়েছে। ভারতে স্বাধীনতার পর থেকে গৃহীত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি, জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থেই কাজ করেছে। ভারতের পুঁজিবাদ স্বাধীনতার পর বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাজার সংকটের মধ্যেই নিজেকে যত দ্রুত সম্ভব শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির উপর দেশের অর্থনীতিতে কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। একইভাবে ভারতের একচেটিয়া লগ্নী পুঁজিও যাতে জাতীয় অর্তনীতিতে 'ভারসাম্য' রক্ষা করেই বিদেশে রফতানি হয়, তার জন্য পুঁজি রফতানির উপরও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়মেই ভারতের একচেটিয়া পুঁজি ক্রমেই আরও শক্তিশালী হয়েছে, তার বৈদেশিক রফতানির চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাঝেই বিড়লার লগ্নী পুঁজি কেনিয়া ও আফ্রো-এশিয়ার দুর্বলতর দেশগুলির কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমশক্তি লুঠ করতে বিদেশে বিনিয়োজিত হয়েছে। রাষ্ট্র তখন কেনিয়ায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীর শাখা খুলে, বিড়লাকে পুঁজি যোগানোর এবং পুঁজির নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছে। কালক্রমে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি আরও স্ফীত হয়েছে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ সমাজের উপরতলায় ৮/৯ কোটি মানুষের মধ্যে কিছু বাড়তি ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি করেছে, যাদের মধ্যে আধুনিক বিলাসপণ্য ব্যবহারের প্রবণতা ও ক্ষমতা দুইই আছে। এই বাজারের চাহিদার উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি দেশে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের উপর পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার দাবী তুলেছে। একই সঙ্গে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির বিশ্ববাজারের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এখন আমেরিকা-

ইউরোপের বাজারে ঢুকতে চায়। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব একটি বড় বাধা। একে কাটাবার জন্যই ভারতে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ অবাধ করার দাবী উঠেছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির এই উচ্চাভিলাষ বুঝেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের শর্ত হিসাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার খুলে দেওয়ার দাবী জানিয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে ভারতে বিদেশী ভোগ্যপণ্য আমাদনি অবাধ করতে হবে। একেই বলা হচ্ছে 'দেওয়া-নেওয়া'র নীতি। ঠিক একথাই মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্র্যাংক উইজনার ভারতে পদার্পণ করেই বলেছেন। ভারতের শাসকশ্রেণীও বলছে, ভারতের একচেটিয়া কোম্পানীগুলিকে বিদেশের বাজারে ঢুকতে হলে, ভারতের বাজারে বিদেশী পণ্যের আমদানি ধাপে ধাপে অবাধ করতেই হবে।

এখানে কিছুটা বিরোধও ঘটছে। বিদেশী কোম্পানী ভারতের ৮/৯ কোটি 'মধ্যবিত্ত'র বাজারকে কেন্দ্র করেই এদেশে আসছে ; আবার ভারতের একচেটে পুঁজিপতিদেরও দেশীয় বাজার বলতে এটাই। সুতরাং দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভোগ্য পণ্য শিল্প ও ৮/৯ কোটি মানুষের বাজার। তাই ভারতের একচেটিয়া কোম্পানীগুলি অতি দ্রুত নিজেদের পুঁজির জোর ও উৎপাদনশক্তি বাড়িয়ে জাতীয় বাজারে নিজেদের আধিপত্যের এলাকা বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়েছে। ফলে, ভারতীয় অর্থনীতিতে 'টেক ওভার' 'মার্জার' ও 'এ্যামালগ্যামেশন'-এর ঘোড় দৌড় চলছে।

ইতিপূর্বে উৎপাদনের যেসব ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজির জন্য নির্ধারিত এবং একচেটিয়া পুঁজির জন্য নিষিদ্ধ ছিল, সেই নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হয়েছে। এক এক শিল্পে এক এক রকম বিদেশী মালিকানার সিলিং বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। শেয়ার বাজারে কোন দেশীয় কোম্পানীর মোট পুঁজির (paid up capital) ৫ শতাংশের বেশী কোন বিদেশী কোম্পানী নিতে পারবে না এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর দ্বারা জাতীয় অর্থনীতিতে দ্রুত দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির কব্জা আরও বিস্তৃত ও দৃঢ় করার চেষ্টা চলছে। এজন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলিকে সংশোধন করা হচ্ছে এবং তা জাতীয় পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করার জন্যই। একইভাবে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে বিদেশী লগ্নীপুঁজির যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করার জন্যই রাষ্ট্র, বিদেশী পুঁজির উপর পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দিচ্ছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সরাসরি ইউরোপের বাজার থেকে শেয়ার ইসু করে ও বেসরকারী ঋণের মারফৎ পুঁজি তুলছে, তারাই টাকাকে পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করার দাবী তুলেছে ; শ্রমিক কর্মচারীদের ছাঁটাই করার অবাধ অধিকার, 'অলাভজনক' কারখানা বন্ধ করার অধিকার

— এসব দাবী ভারতের একচেটে পুঁজিও তুলছে। সুতরাং, ভারত রাষ্ট্রের সকল ভূমিকা ও নীতি পরিবর্তন ভারতের একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নী পুঁজির স্বার্থে, ভারতীয় পুঁজির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। অতএব, ভারতের ভূমিকার মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান যুগে, একটি স্বাধীন জাতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভূমিকা ও চরিত্রেরই প্রতিফলন ঘটছে। একারণেই ভারতের উদার আর্থিক নীতি ও গ্যাটে সই দেওয়ার ঘটনাকে যাঁরা ভারত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-হারানো বলে মনে করছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

শ্রী আদিত্য বিড়লা বলেছেন, 'ভারতীয় শিল্প প্রতিযোগিতা ভয় পায় না। প্রতিযোগিতা আমাদের ভয় পাক।' (Mr. Birla declared that the Indian industry was not afraid of competition. Let competition be afraid of us, he thundered. — Eco. Times-23.3.94) আই টি সি কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রী কে এল চুগ বলেছেন, শুধু বিদেশী মালটিন্যাশানালদের এদেশে আনলে চলবে না, ভারতীয় শিল্পপতিদের মালটিন্যাশানাল কোম্পানীর জন্ম দিতে হবে এবং আই টি সি সে পথেই এগোচ্ছে। এগুলি কি পরাধীন বুর্জোয়াশ্রেণীর কণ্ঠস্বর ? অন্যদিকে, ভারতের কৃষি পুঁজিপতিদের অন্যতম মুখপাত্র শ্রী শরদ যোশীর বক্তব্য আরও চমকপ্রদ। তিনি বলেছেন, গ্যাটের মধ্য দিয়ে ভারতীয় কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য পাবার সুযোগ দেখা দিয়েছে ; ভারতে যাতে গ্যাট আইনগুলি ঠিক ঠিক চালু করা হয়, তার জন্য তাঁর সংগঠন বিশেষ জোর দেবে বলে তিনি জানিয়েছেন। (ইন্টারভিউ, ইকনমিক টাইমস্ — ২৮.৬.৯৪)। এই বক্তব্য কি ভারতের কৃষিব্যবস্থায় সামন্তী সম্পর্কের লক্ষণ ? কৃষিতে বৃহৎ জোতচাষের জন্য যারা আজ জমির সিলিং তুলে দেওয়ার কথা বলছে, তারা কি কৃষি-পুঁজিপতিশ্রেণী নয় ! সুতরাং, উদার আর্থিক নীতি থেকে গ্যাটে সই দেওয়া পর্যন্ত সরকার যা কিছু করছে, তার মধ্যে ভারতের পুঁজিবাদের স্বার্থই কাজ করছে। এই অবস্থায় গ্যাট বিরোধী লড়াইকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হলে, তার দ্বারা ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘোরাবার ব্যর্থ চেষ্টাই করা হবে শুধু তাই নয়, এর দ্বারা, জেনে বা না জেনে, ভারতের শোষক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থেরই ধ্বজা ওড়ানো হবে। একচেটিয়া পুঁজির যুগে কোন পুঁজিবাদী দেশে 'মুক্ত বাজার' যেমন আর ফিরে আসতে পারেনা, তেমনই ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই আর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ পেতে পারে না, তা অবশ্যই পুঁজিবাদবিরোধী লড়াই হতে হবে।

ভারতের শ্রমজীবী জনগণের মূল লড়াই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে। অন্যথায় তা দিকভ্রান্ত হতে বাধ্য।

লগ্নী পুঁজির সুদখোর চরিত্র ও গ্যাট

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুতর সংকটের দিকটি ইতিপূর্বে পরিষেবা বাণিজ্যের আলোচনায় এসেছে। মন্দা ও বাজার সংকটের প্রকোপে পড়ে একচেটিয়া পুঁজি স্বদেশে ও বিদেশে ক্রমাগত ব্যাঙ্ক-বীমার সুদের ব্যবসা ও শেয়ার/বন্ডের ফাটকা কারবারে খাটছে। লেনিন, একচেটিয়া পুঁজির এই সুদখোর চরিত্রকে (usurer capital) সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পুঁজিবাদের অনিবার্য ক্ষয়িষ্ণু ও পরগাছা চারিত্রিক (decay & parasitism) বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই তদানীন্তন সময়েই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে সুদখোর রাষ্ট্র (Rentier State) বলে অভিহিত করা হয়েছিল এবং দেখানো হয়েছিল যে, এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের 'বাণিজ্য' আয়ের থেকে সুদের আয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। ("The income of the rentiers is five times greater than the income obtained from foreign trade of the biggest "trading" country of the world ! This is the essence of imperialism & imperialist parasitism" — Lenin Vol-22— p.277)।

এটা আজ কেবল মার্কিন পুঁজির ক্ষেত্রেই নয়, জাপান ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির ক্ষেত্রেও তা সত্য। জাপানের মোট বিদেশী বিনিয়োগের মধ্যে নানা ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং-এ মাত্র ৩০ শতাংশ পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছে, অন্যদিকে ব্যাঙ্ক, বীমা, ফিনান্স ও রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অংশ মোট বিনিয়োগের ৩৩.৬ শতাংশ। এই পরিমাণ মার্কিন পুঁজির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ। তার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, বিশ্বের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ১৯৯০ সালের মার্কিন লগ্নী পুঁজির মোট বিনিয়োগের মধ্যে ৪৩০০ কোটি ডলার সুদ/শেয়ারের কারবারে গেছে — যা ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে বিনিয়োগের থেকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশি।

এমনকি ইউরোপের শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মার্কিন লগ্নী পুঁজি সুদ/শেয়ারের ব্যবসায় যত পরিমাণ (২৫%) খাটছে, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সেই অনুপাত অনেক বেশি (৪০%)। সুতরাং উন্নয়শীল বা অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাঙ্ক-বীমা-রিয়েল এস্টেট ও শেয়ার বাজারই মার্কিন পুঁজির প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (তথ্য সূত্র ঃ Globalisation to What End : Harry

Magdoff । Monthly Review)। আই এম এফ ও বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক হিসাব বলছে, ১৯৯০ থেকে "৯৩ — এই তিন বছরে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শেয়ার / বন্ডের বাজারে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ (portfolio investment) তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু '৯৩ সালেই যার পরিমাণ ১১,৩০০ কোটি ডলার। (দি স্টেটসম্যান, ১৭.৯.৯৪)

১৯৩০ সালের মহামন্দা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল। যুদ্ধের পর মার্কিন অর্থনীতির আপাতঃ 'স্থিতিশীল' বাইরের চেহারার মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কোন গুণ বা ম্যাজিক ছিল না ; "ঠান্ডা যুদ্ধে'র জিগির তুলে মার্কিন অর্থনীতিকে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত করে তার তলায় মন্দা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল মাত্র। বিশ্বজোড়া যুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেই তা করা হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর সেই মন্দাই আরও প্রকট রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির সুদ ও ফাটকা কারবারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় লগ্নী পুঁজির ফাটকা কারবারের ব্যাপ্তি ও বিশালতা এখন কার্যতঃ সকল পরিমাপের বাইরে চলে গেছে বলা যায়। উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন (ফাটকা) লগ্নী পুঁজির স্ফীতি, যা বাজার সংকটের ফলে বিপুল আকার নিচ্ছে, সেটাই আবার পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটকে তীব্রতর করছে। তাই, বনেদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পূর্বেকার উপায় ও পদ্ধতিগুলির সংশোধন ঘটিয়ে বিপুল ফাটকা লগ্নী পুঁজিকে উৎপাদনে টেনে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা মনে করছে, অর্থনীতির ও বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রকে যদি আরও উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, উচ্চ থেকে উচ্চতর মুনাফা অর্জনের পথে লগ্নী পুঁজি যা কিছু বাধা বলে মনে করছে, তা যদি অপসারণ করা হয় ; সর্বোপরি, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির শ্রমজীবী জনগণ, ন্যূনতম আত্মরক্ষার জন্য এ যাবৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় আইনের যতটুকু কানুনী সুযোগ পেয়েছে, তাও যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তবেই পুঁজি হয়তো ফাটকা ছেড়ে উৎপাদনে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণ থেকে সুরু করে, দেশীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রকে আরও উন্মুক্ত করে দেওয়া, ও সর্বোপরি বিশ্বে পণ্য লেন-দেন বাড়াবার জন্য একটা আন্তর্জাতিক স্থায়ী বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তোলার পিছনে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সেই প্রচেষ্টাও কাজ করছে বলা হলে, তা অমূলক হবে না। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই এখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পুরনো উপায় পদ্ধতিগুলি 'সংশোধন' করে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সংকটের গহ্বর থেকে তুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

এখন শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির একচেটিয়া লগ্নী পুঁজি যে সুদ/ফাটকার কারবারকে কেন্দ্র করে, দেশে দেশে, বিশেষ করে বিশ্বের অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী

দেশগুলিতে ছুটছে, তাকে ভিত্তি করেই ভারতের শাসকশ্রেণীর উদার আর্থিক ও শিল্পনীতিটি রচিত হয়েছে। একারণেই ভারতের শেয়ার বাজারকে বিদেশী লগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলির (Foreign Institutional Investors) জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার বাড়াবার নামেই এটি করা হয়েছে। একই কারণ দেখিয়ে ভারতীয় কোম্পানীগুলির জন্য বিদেশী শেয়ার বাজার থেকে টাকা তোলার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় কোম্পানীদের তোলা টাকা কোথায় খাটছে, তা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বলতে যা ভারতে আসছে, তারও অধিকাংশ যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারে। ১৯৯৩-৯৪ সালে ভারতে মোট বিদেশী পুঁজি যা এসেছে, তার মধ্যে বিদেশী লগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫০ কোটি ডলার, ভারতের কোম্পানীগুলি বিদেশে শেয়ার/বন্ড বেচে পুঁজি এনেছে ২৬০ কোটি ডলার ; আর, ভারতের যেসব বিদেশী কোম্পানী আগেই ছিল, বিদেশী মালিকরা তাতে শেয়ার বাড়িয়েছে ৬০ কোটি ডলারের মত। তাহলে বিদেশী পুঁজি দিয়ে নতুন শিল্প কোথায় হচ্ছে ? যতটুকু যা হচ্ছে, তাও হাই-টেক শিল্প। অথচ ভারতের শাসকশ্রেণী দেশের জনগণকে বলছে, বিদেশী পুঁজি আসলে দেশের শিল্পায়ন হবে, বেকারদের কাজ হবে। একি প্রতারণা নয় ? বস্তুতঃ, বিদেশী পুঁজির দ্বারা যদি ভারতের জনজীবনের প্রকৃত উন্নয়ন হত, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল কেন ?

অধুনা উৎপাদনবৃদ্ধির (GDP) জিগির তোলা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন উৎপাদনবৃদ্ধি হলেই, জনজীবনের সমস্যার লাঘব হয়ে যাবে ! প্রশ্ন হচ্ছে, গত ৪৭ বছরে ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হারে উৎপাদনবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু তার ফল জনগণ পেয়েছে কি ? শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধি হয়েছে, তবে সেই সব দেশে কোটি কোটি বেকার কেন ? ভারতে যদি দেশী-বিদেশী পুঁজি ও আধুনিক প্রযুক্তির মিলনের মধ্যে দিয়ে, কৃষিতে কফি, রবার, তামাক, দেশী মদের উৎপাদন বাড়ে, শিল্পে টি ভি, গাড়ি, সেন্ট, ফ্রিজ-এর উৎপাদন বাড়ে, তবে দেশের ৮০ কোটি জনগণের কি লাভ ? ভারতে যদি আধুনিক বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন বাড়ে, তবে গ্রাম-শহরের বেকার চাষী-মজুরের ঘরের স্ত্রীকন্যার গায়ে কি সেই বস্ত্র দেখা যাবে ? পুঁজিবাদে উৎপাদনবৃদ্ধি মানে তা জনগণের উন্নয়ন নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত পুঁজি কখনই জনগণের জীবনধারণের মান উন্নত করার জন্য বিনিয়োগ হয়না ; তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা।

ভারতের শাসক জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই জনগণের মূল শত্রু

তাহলে সমগ্র আলোচনা থেকে আমরা দুটি মূল সিদ্ধান্ত টানতে পারি —

১। শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে বাজার ভাগাভাগির একটা 'শান্তিপূর্ণ' সমঝোতার উদ্দেশ্যেই নতুন গ্যাট আইন তৈরি করেছে। সমগ্র বিশ্বে লগ্নী পুঁজির জাল ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াবার চেষ্টা করছে ; বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ববাজারে তার পূর্ণ আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়েছে।

২। ভারতের শাসকশ্রেণী গ্যাট সমঝোতার শরিক হয়েছে ভারতের অর্থনীতিতে বিদেশী লগ্নী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বাড়াবার উদ্দেশ্যে। এটি ভারতের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলির দাবী, অন্যথায় তাদের বিশ্ববাজারের ভাগ পাওয়ার লক্ষ্যটি পূরণে অসুবিধা হচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যেই শাসকশ্রেণী উদার আর্থিক ও শিল্পনীতির দ্বারা ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পূর্বেকার উপায়-পদ্ধতির সংশোধন করে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে তাদের আরও শক্তিবৃদ্ধি করার রাস্তা নিয়েছে এবং ধাপে ধাপে বিদেশী পুঁজির জন্য দরজা খুলে দিয়েছে ও দিচ্ছে — যাতে বিদেশী একচেটে পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় একচেটে পুঁজির যৌথ উদ্যোগের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এর ফলে জনজীবনে কি ফল বর্তাবে, তা আমরা গ্যাট-এর শর্তগুলির আলোচনায় উল্লেখ করেছি। ভারতের শাসকশ্রেণী বলছে, অর্থনীতি যে গভীর সংকটে পড়েছে, তাকে বাঁচাতে হলে এছাড়া বিকল্প কি ? এ হচ্ছে শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধূর্ত বুর্জোয়া প্রচার ! ভারতীয় অর্থনীতির সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সংকট ; যারা এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায় 'বিকল্প পথে'র সন্ধান দেওয়ার দায় তাদের — জনগণের নয়। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, ভারতের সমস্ত বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংসদীয় দলগুলি যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তারাই সংকট সমাধানের পুঁজিবাদী বিকল্প পথের সন্ধান করছে এবং শেষপর্যন্ত 'বিকল্প নেই' ঘোষণা করে তারা কংগ্রেস সরকারের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে।

ভারতের শাসকশ্রেণী এক সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় যে পথ আজ গ্রহণ করেছে, সেটা পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে আরও বৃহত্তর সংকটে ঠেলে দেবে যার সমস্ত ধাক্কা যথারীতি পড়বে জনজীবনে। অর্থনীতিতে তথাকথিত অবাধ

প্রতিযোগিতার খোলসের তলায় একচেটিয়া পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও আধিপত্য যত বাড়তে থাকবে, ততই তার চাপে জনসাধারণের জীবনধারণ করাই অসহ্য হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই গ্রাম থেকে শহরমুখী বেকারের ঢল নামতে সুরু করেছে। কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগ হ্রাস করার এটি ফল। এরপর রফতানিমুখী আধুনিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য যত ঝোঁক বাড়বে, ততই জমির কেন্দ্রীকরণ আরও দ্রুত ঘটবে, ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে, গ্রামীণ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে ভারতীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার নামে কলকারখানায় অঘোষিত বিদায়নীতি ও ছাঁটাই সুরু হয়েছে। বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা যত বাড়বে, ততই আরও শ্রমিক ছাঁটাই করার দাবী উঠবে ; শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা আরও বাড়াতে হবে, মজুরিবৃদ্ধির দাবী করা চলবে না বলে ঘোষণা করা হবে। শিল্পশ্রমিক বলতে অস্থায়ী কন্ট্রাক্ট শ্রমিকের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে — যাদের দৈনন্দিন বাজার থেকে পণ্য কেনার মত মালিকের ভাড়াটে ঠিকাদাররা দিনমজুরিতে কিনবে। মন্দা-মুদ্রাস্ফীতি 'নিয়ন্ত্রণে'র পুরনো পুঁজিবাদী উপায়-পদ্ধতি আগের মত কাজ করবে না। দেশীয় পুঁজির বিদেশ রফতানির উপরও পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে থাকবে। টাকা পূর্ণ বিনিময়যোগ্য হয়ে গেলে, ভারতীয় পুঁজি দেশে-বিদেশে যেখানে বেশি মুনাফার সুযোগ দেখবে, সেখানেই ছুটবে। তখন আবার দেশীয় পুঁজির বিদেশ রফতানি আটকাবার কথা বলে শ্রমজীবী জনগণকে আরও 'আত্মত্যাগ' করার আহ্বান জানিয়ে শাসকশ্রেণী বলবে, 'এছাড়া কোন বিকল্প নেই।' সমাজে আয়ের বৈষম্য আরও বাড়বে। শিক্ষা মরবে, বিজ্ঞান গবেষণা মার খাবে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে আসছে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি — যা দেশের অবশিষ্ট নৈতিক বলকেও ধ্বসিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীও সেটাই চায়। যাতে ভারতের যুবশক্তি বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার তেজ না পায়।

এই সর্বগ্রাসী সর্বনাশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই দরকার। তার জন্য দরকার সঠিক শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্ত আন্দোলন। ভারতের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেদের বাড়তি মুনাফার লালসা চরিতার্থ করতে আমাদের দেশ ও জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে এই লড়াই ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে, যাতে সামিল হওয়ার জন্য আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল জনগণকে আমরা আহ্বান জানাই।

কমরেড প্রভাস ঘোষ কর্তৃক এস ইউ সি আই অফিস, ৪৮, লেনিন সরণী কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৫২বি ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৫ টাকা